প্রসঙ্গ : প্রেমেন্দ্র মিত্র

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র : ১৩৭৮
আগস্ট : ১৯৭১

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় পরিদপ্তর
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

মুদ্রণে
বাংলা একাডেমীর
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় পরিদপ্তরের
মুদ্রণ বিভাগ

প্রচ্ছদ
আব্দুল বাসেত

সূচীপত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবন দর্শন

"আমার জীবনকে আমি প্রদীপ করে জেবলেছিলন্ম, তোমার আরতি করবো বলে।"

[নেবা দীপ / আমের বোল]

মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে লেখা কবিতার এই পংক্তিটির অণ্‌রণন প্রেমেন্দ্র মিত্রের সারা জীবন ধরে চলেছে। সারস্বত সাধনার মধ্যে তিনি নিজের জীবনকে 'প্রদীপ' করেছেন, এবং তার আলোতে তিনি জীবনদেবতার বা পরমপ্রিয়ের আরতি করছেন।

অলডাস্ হাক্সলি বলেছিলেন মান্‌ষ তার নিজস্ব দর্শন নিয়ে (Philosophy of life)[১] বে'চে থাকে। শ্‌ধ্‌ শিল্পী, কবি, দার্শনিক নয় সাধারণ মান্‌ষকেও ঐ একই পদ্ধতিতে বাচতে হয়। তবে এই জীবনদর্শন কারো ব্যক্ত, কারো অব্যক্ত। এই অব্যক্ত জীবন-দর্শন ছাড়িয়ে থাকে—শিল্পীর ক্ষেত্রে শিল্প-কলায়, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যকৃতিতে সাধারণ মান্‌ষের ক্ষেত্রে তার কাজে। কল্লোলয্‌গের ত্রয়ী—অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র ও ব্‌দ্ধদেবও অন্‌র্‌পভাবে নিজ নিজ জীবন-দর্শনের চিহ্ন সাহিত্যকৃতির মধ্যে রেখেছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগ্‌প্ত রোম্যান্টিকতার ধারা বেয়ে ঈশ্বর-সাধনায় ('পরমপ্‌র্‌ষ রামকৃষ্ণ', ইত্যাদি) মগ্ন হয়েছেন, ব্‌দ্ধদেব বস্‌ অম্‌তাভিলাষী হয়ে ('বন্দীর বন্দনা') ভালবাসতে চান। এই রোম্যান্টিক রিয়েলিজম-এর পাশে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সংশয়াচ্ছন্ন প্রশ্নমনস্কমন সীমা ও অসীমের টানাপোড়েনে নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা টানতে পারেননি। চিকিৎসা কর্মকে যিনি জীবনে পেশা হিসেবে নেবেন বলে একদিন ভেবেছিলেন, তাঁকেই বিশ্বকোষের খাতায় অহরহ বিহার করতে দেখা যায়, কখনো চড়্‌ই পাখীর কলহ তিনি শোনেন, কখনও বা সারা দ্‌নিয়ার খোয়া ভাঙেন আর খাল কাটেন, পথ তৈরী করেন—স্বপ্ন বাসরে বিরহিণী বাতি মিথ্যেই সারারাত ধরে অপেক্ষা করে—কারণ তাঁর যে সময় নেই – তিনি স্‌দ্‌রের আহ্বান শ্‌নেছেন।

সেই সঙ্গে এই জীবনের জন্য কবি জীবন-দেবতাকে প্রণাম জানাতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা একটি চিঠিতে তার প্রকাশ: " জীবন কেন পেয়েছিলাম তা যখন জানি না, জানি না কোন্ পুণ্যে, তখন হারাবার সময় কৈফিয়ৎ চাইবার অধিকার আছে ভাই? খোঁড়া হয়ে জন্মাইনি, বিকৃত হয়ে জন্মাইনি—মার কোল পেলাম, বন্ধুর বুক পেলাম, নারীর হৃদয় পেলাম, তা যতটুকু কালের জন্যেই হোক্ না—আকাশ দেখেছি, সাগরের সংগীত শুনেছি, আমার চোখের সামনে ঋতুর মিছিল গেছে বার বার, অন্ধকারে তারা ফুটেছে, ঝড় হেঁকে গেছে, বৃষ্টি পড়েছে, চিকুর খেলেছে—কত লীলা কত রহস্য, কত বিস্ময়! তবে জীবন-দেবতাকে কেন না প্রণাম করবো ভাই। কেন না বলবো ধন্য আমি—নমো নমো হে জীবন দেবতা।"[২] মানবজন্মের জন্য যে কবি জীবন-দেবতাকে নমস্কার জানালেন—তিনি জীবনের তরী এক ঘাটে না বেঁধে খেয়ালখুশি মত নানা ঘাটে বেঁধেছেন—কিন্তু প্রতিটি তরণী পূর্ণশস্যসম্ভারে—।

সীমা থেকে অসীমে এবং অসীম থেকে সীমায় আসা-যাওয়ার মধ্যেই কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রোজ্জ্বল। জীবনে কোন বিশেষ কর্মে যেমন নিজেকে নিযুক্ত রাখেননি (শিক্ষকতা—কৃষিশিক্ষা—টালি খোলার ম্যানেজারি,—গবেষণা সহায়তা—আকাশবাণীর প্রোগ্রাম প্রোডিউসার হিসেবে কাজ করা - চিত্র পরিচালনা—সাহিত্য রচনা), তেমনি সাহিত্যকর্মের মধ্যে শুধু কবিতা নয়, ছোটগল্প-উপন্যাস-শিশুসাহিত্য-প্রবন্ধ-নাটক-পত্রিকা সম্পাদনায় তাঁর যাযাবরী (বোহেমীয়) মনোভাব অটুট আছে। যেন কোথায় শান্তি স্বস্তি পাচ্ছেন না - কোন একটি বিষয়ে তাঁর স্থিতি নেই—আছে সংশয় কারণ তাঁর একটি পত্রে প্রতিভাত। "কিন্তু আসল কথা কি জানিস্ অচিন্, ভালো লাগে না—সত্যি ভালো লাগে না। বন্ধুর প্রেমে আনন্দ নেই, নারীর মুখেও আনন্দ নেই, নিখিল বিশ্বে প্রাণের সমারোহ চলেছে তাতেও পাই না কোন আনন্দ।"[৩] সেইজন্য তিনি আনন্দ রূপ অমৃতের অন্বেষণে সারাজীবন ব্যাপৃত।

সেইজন্যেই তাঁর জিজ্ঞাসা প্রতিটি ক্ষেত্রেই। কবি বলেন, "কি সে চায়, এ ছবিতে? / একটি সবুজ ছিটে—/ জীবনের দৃপ্ত বিদ্রোহের? / এক ফোঁটা সাদা রং / হাঁস নয়, / সব কিছু দিগন্ত ছড়ানো / দুঃসাহসী অক্লান্ত জিজ্ঞাসা?" ['ছবি' / 'কখনো মেঘ'] জিজ্ঞাসাকেও কবি জিজ্ঞাসা চিহ্নে চিহ্নিত করেছেন।

তাই প্রশ্নের সোপান বেয়েই তাঁর অভিযাত্রা। একটি কবিতায় তিনি নিজের বিরুদ্ধে নিজে চক্রান্ত করেই গতিময়তার প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেছেন।

'মৌসুমী' উপন্যাসে বলেছিলেনগ গতিই জীবন, এই কবিতার সেই গতি আত্মশাসন এবং আত্মবিদ্রোহের দ্বন্দ্ববাদের শক্তিতে পূর্ণ। কবি বলেন, "আমিই শাসন, / আমিই বিদ্রোহ। / শিরায় শোণিতে মজ্জায় অস্থিতে / নিজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত বেড়াচ্ছি বয়ে / ...এই চক্রান্তই আমার ইতিহাসকে ছোটায় / এই চক্রান্তই লেপে দেয় তার ছোপ। / সে ছোপ মুছতে পারলে / পৌঁছোতাম বুঝি / এ সৃষ্টির সব ধাঁধার পেছনে! / কে চায় সে ধাঁধার উত্তর?"[৪]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের দ্বৈত সত্তা তাঁর জীবন-দর্শনের মূল। তিনি বলেন, "দ্বিজ হব তপস্যায় / এই মোর গূঢ় অঙ্গীকার। / তোমাকেও তাই খুঁজি না'ক নগ্নবাসনায়। তার পর তোমাকেও কখন ছাড়িয়ে দ্বিজ হই তপোবলে / অন্তহীন রহস্য সত্তায়।"[৫] একদিন যদি নারীর দৈহিক প্রেমের মত্ততায় মগ্ন ছিলেন, আজ তিনি দেহাতীত—ইন্দ্রিয়াতীত এক পরম-অন্ত-হীন রহস্য সত্তায় লীন হতে চান আপন তপপ্রভাবে। এইভাবে তাঁর দ্বৈতসত্তার দ্বন্দ্বে তিনি এগিয়ে চলেছেন। ব্যস্ত পৃথিবীর বস্তুতান্ত্রিক ঐশ্বর্যের পাশে অন্তর্জগতের সন্ধান চলে। তিনি বলেন; 'একপিঠে এ সত্তার সময় বাহিত / উদয়াস্ত ইতিহাস চলে, / অন্য পিঠে খুঁজে ফিরি নিজেকেই নিজের অতলে।" ['দুপিঠে' / 'নদীর নিকটে'] সত্তার এই রূপ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা একটি চিঠিতে পাই: "সত্যি নিজেকে আর চিনতে পারি না। মনে হয় প্রেমেন বন্ধু ছিল তাকে আমাদের মধ্যে খুঁজে পাই না। মনে হয় গাছের যে ডালপালা একদিন দু বাহু মেলে আকাশ আলোর জন্য তপস্যা করত যার লোভ ছিল আকাশের নক্ষত্র, সে ডালপালা আজ যে কে কেটে ছারখার করে দিয়েছে। শুধু অন্ধকার। মাটির জীবন্মৃত গাছের মূলগুলো হাতড়ে হাতড়ে অন্বেষণ করছে শুধু খাবার, মাটি আর কাদা, শুধু বেঁচে থাকা—, কেঁচোর মত বেঁচে থাকা। এ প্রেমেন তোদের বন্ধু ছিল না বোধহয়।"[৬]

এই অন্ধকার থেকে আলোর মন্দিরে যাবার জন্যে কান্না তিনি আজীবন কেঁদেছেন। কারণ, "এ-এক জোনাকি-মন / জ্বলে আর নেভে, / অন্ধকার পার হ'বে ভেবে / ইতিউতি ধায়;"।[৭] কিন্তু জানা-অজানা জগতে উত্তরণের জন্য তাঁর মন সচেষ্ট। এই জোনাকি-মন চায়, 'জানা না-জানার চেয়ে চায় কোনো অন্য উত্তরণ'![৮]

কোনকিছুই ধ্রুবসত্য নয় বলেই কবি মনে করেন এবং সেই জন্য তাঁর এই দোলাচলবৃত্তি। একদিন কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথে হাঁটতে হাঁটতে Ingersoll[৯] এর লেখা একটা ছেঁড়া বই তাঁকে ঈশ্বর সম্বন্ধে সংশয়াচ্ছন্ন

করেছিল—সেই সংশয়' তার জীবনের লক্ষ্য বুঝি স্থির করে দিতে পারেনি। তাই তিনি 'যিনি বিধাতা' উপন্যাসে জানালেন, "ধরে রেখো না, কিছুই ধ্রুব বলে ধরে রেখো না। নিজেকে কোথায় খুঁজছো? তোমার দেহে? তোমার মনে? সেখানে নেই। তাহলে কি আত্মায়? সেই খোঁজেও বেরিয়ে গিয়েছিল নির্মলা। মাথা মুড়িয়ে অলংকার থেকে অহংকার সব কিছু ত্যাগ করে।…নিজেকে সে আত্মার মধ্যে খোঁজার কথা ভেবেছিল না। সন্ন্যাসিনী হয়ে ঘুরেছিল তীর্থে তীর্থে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু যা খুঁজছিল তা পেয়েছে কি? দেহে ও মনে প্রকৃতির দম দেওয়া পুতুল হওয়ায় নিয়তি অস্বীকার করেছে। আত্মার খোঁজ থেকেও ফিরবে। পুলকেশই নির্মলাকে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু কোথায়?[১০] এই সীমা ও অসীমের মধ্যে যাওয়া-আসার জন্য কবি অবিরত বয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন; "এ সৃষ্টির গূঢ় অর্থ স্রোতেই ভাসানো। / কোথায় ধরবে তাকে থেমে? / তীর নেই তট নেই / বিধাতার নেমে দাঁড়াবার। / শুধু বওয়া / অবিরত অনিয়ত হওয়া।"[১১]

জীবন-দর্শনের মধ্যে নতুন পৃথিবী সৃষ্টিও একটি অনুষঙ্গ। এই গ্লানি জর্জর যন্ত্র-সভ্যতা পুষ্ট পৃথিবীর ছবি তিনি আর দেখতে চাননি। তাই তিনি বলেন, "দুনিয়া পাল্টে নয়া জমানা আনতে হবে, টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে হবে ওপরের ঘেয়ো দুর্গন্ধ বদবো চামড়া।"[১২] অন্য একটি উপন্যাসে ('ময় দানবের দ্বীপ') তিনি বলেন: "পৃথিবী জয় করতে চাই, আবার নতুন করে গড়বার জন্য। দেখতে পাচ্ছেন না, পৃথিবীময় আজ কী বিশৃঙ্খলা' অনাচার, অবিচার সেই জন্যেই আমরা একসঙ্গে সমস্ত পৃথিবী জয় করতে চাই। পুরোনো পোড়ো বাড়ি—যেমন ধূলিসাৎ করে নতুন করে তৈরী করে, তেমনি করে একেবারে নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করতে চাই—যেমন দেশ নয়, জাতি নয়, মানুষই সবচেয়ে বড়।"[১৩]

কবি 'প্রথমা' কাব্যে লিখেছিলেন, "আমি যুগ থেকে যুগান্তরে দেশ থেকে দেশান্তরে / মনের সড়ক তৈরী করলাম। / আমার থামা তবু হবে না। / পথই আমার প্রাণ—আমার অসীম পথের পিপাসা!" ['রাস্তা'] এবং এই পিপাসা নিয়ে তিনি মহাকাশ যাত্রা করেছিলেন সাহিত্যে ['অসীম অমর জীবাণু! / নিখিলের বিস্ময়! / দূরতম নক্ষত্রের পথ আমি খুঁজি আজ!" ['রাস্তা / প্রথমা']। কিন্তু আশ্চর্য্য এই পথের পিপাসা নিয়ে কোন বিশেষ লক্ষ্যে তিনি পৌঁছাবার সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। তিনি অচিন্ত্য সেনগুপ্তকে লিখেছিলেন, "…মনে হত পথটা জানি চলাটাই শক্ত—এখন দেখছি চলার চেয়ে পথটা জানা কম কথা নয়। এই ধর জীবনের একটা Programme

দিই! বিদ্যাজ্ঞান স্বাস্থ্য শক্তি সৌন্দর্য শিল্প সাধনা গেল প্রথম। দ্বিতীয় ভালবাসা পাবার। ধর পেলুম কিংবা পেলুম না। তারপর আরো সাধনা পরিপূর্ণতার জন্যে। পরের উপকার, বিশ্ব মানবের জন্যে দরদ, পৃথিবী জোড়া দুঃখ দারিদ্র্য হাহাকারের প্রতিকার চেষ্টায় যথাসাধ্য নিজেকে লাগান। তৃতীয় সারাজীবন ধরেই ভূমার জন্য তপস্যা, সারাজীবন ধরে দুঃখকে অবহেলা করবার ব্যর্থতাকে তুচ্ছ করবার মৃত্যুকে উপহাস করবার শক্তি অর্জন।"[১৪] কিন্তু এখানেও সংশয়। তাই ঐ চিঠির শেষে লিখেছেন, 'বেশ মন্দ কি! কিন্তু যত সহজ দেখাচ্ছে ব্যাপারটা, আসলে মোটেই এমনি সহজে মীমাংসা হয় না। কি যে ভূমা আর কি যে পরিপূর্ণতা, কি যে মানুষের উপকার আর কি যে শিল্প আর জ্ঞান তার কি মীমাংসা হল?··· না, মাথা গুলিয়ে যায়। আসল কথা হচ্ছে এই যে, আফ্রিকার সবচেয়ে আদিম অসভ্য Bushman-এর একটা বিংশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ এরোপ্লেন পেয়ে যে অবস্থা হয় আমাদের এই জীবনটা নিয়ে হয়েছে তাই। আমরা জানি না এটা কি এবং কেন? কোথায় কি তা তো জানিই না, এর সার্থকতা ও উদ্দেশ্য কি তাও জানি না।'[১৫]

এই সীমা-অসীমের মিলন ও দ্বন্দ্বই প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবন দর্শনের ভিত্তি ভূমি।

সম্প্রতি-প্রকাশিত কবি প্রেমেন্দ্রের কৈশোরের একটি কবিতায় এই বৃত্তির বৈপরীত্য (contrast) দেখা দিলেও সারাজীবন ধরে কবির জীবন নিয়ে পরীক্ষা চলছেই। ["আলোয় তোমায় দেখেছিলুম অন্ধকারে তুমি অবাধ / হয়ে ধরা দিলে তোমায় পেলুম" / 'নেবা দীপ' / 'আমের বোল' / ছয় দশকের কবিতা পৃঃ ৩] এখানেই সমসাময়িক কবিদের থেকে তিনি স্বতন্ত্র।

॥ গ্রন্থনির্দেশ ॥

১. Aldous Huxley, End and Means. Page 252

২. কল্লোলযুগ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ এম. সি. সরকার ১৩৭২, পৃঃ ২২

৩. ঐ পৃঃ ১১

৪. চক্রান্ত / নদীর নিকটে

৫. দ্বিজ / হরিণ-চিতা-চিল

৬ কল্লোলযুগ ঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ এম. সি. সরকার ঃ ১৩৭২, পৃঃ ২০

৭. জোনাকিমন / সাগর থেকে ফেরা

৮. ঐ

৯. শেল সংসার সাহস / বর্বর যুগের পর, কথামালা প্রকাশনী, ১৩৬৬

১০. যিনি বিধাতা / শারদীয় যুগান্তর, ১৩৭৭, পৃঃ ৩০৬

১১. বহুতা / অথবা কিন্নর

১২. 'সেই যে শহর রাজোলি' / সুরভী প্রকাশনী ১৯৭৪ পৃঃ ৫৬

১৩. ''ময়দানবের দ্বীপ'' অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির ১৯৬৫, পৃঃ ৯০

১৪. কল্লোলযুগ ঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ এম. সি. সরকার ১৩৭২, পৃঃ ১০১-১০২

১৫. ঐ পৃঃ ১০২

রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশরী' ও সমকালীন দুটি বারোয়ারী উপন্যাস

'বাঁশরি' রবীন্দ্রনাথের শেষবেলাকার নাটক। 'ভারতবর্ষ" পত্রিকায় [১৩৪০ কার্তিক-পৌষ] এই নামেই প্রকাশিত। কিন্তু প্রথম খসড়ায় এর নামকরণ ছিল 'ললাটের লিখন'। এবং একটি মৌলিক চরিত্র যে পৃথ্বীশ নামে মূল খসড়ায় ছিল তা প্রকাশের সময় রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়ায় 'ক্ষিতীশ'-এ। মনে হয় 'ললাটের লিখন' যদি নাটকটির নামকরণ থাকতো তাহলে বাঁশরির জীবনের ট্রাজিডি বা মনের মানুষকে হারানোর বেদনা রূপায়িত করার আর্তির সঙ্গে প্রাপ্তির আনন্দ ফুটে উঠতো না। 'বাঁশরি' নামকরণে একটি পজিটিভ প্রাপ্তিই নাটকের সার্থকতার পথে নিয়ে গেল, বাঁশরি পরিণতিতে তার মনের মানুষকেই পেল।

'বাঁশরি' নাটকটি নিয়ে সমালোচনার শেষ নেই। ড' নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন, "ভাষায় ও বচনভঙ্গিতে 'বাঁশরি'-দুইবোন-মালঞ্চ চার অধ্যায়' উপন্যাসের একসূত্রে গাঁথা, এমনকি এই হিসেবে শেষের কবিতার ব্যঙ্গ ও ও epigram সমৃদ্ধ বঙ্কিম ও নতুন বাকভঙ্গি ও ভাষার সঙ্গে এই গ্রন্থের একটা দূর আত্মীয়তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়, যদিও পরবর্তী উপন্যাসগুলির মতনই 'বাঁশরি'র ভাষায় ও বাকভঙ্গিতে 'শেষের কবিতা'র শাণিত দীপ্তি, আলো ঝলমল চমক অনেক দুর্বল ও স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে।" সে যাই-হোক, এই নাটকের ঘাত-প্রতিঘাত যে চরিত্রকে নিয়ে - সেই নাটকে এই চরিত্র প্রকৃতপক্ষে উপেক্ষিত এবং কম সমালোচকের দৃষ্টি পড়েছে এর ওপর। অবশ্য নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায় এই ক্ষিতীশ চরিত্র খুব জীবন্ত এবং বাঁশরি চরিত্রের নাটকীয় দীপ্তি -অনেকখানি সম্ভব হয়েছে ক্ষিতীশকে অবলম্বন করে।"[১] কে এই ক্ষিতীশ? কেন তার আবির্ভাব এই নাটকে? আর কেনই তাকে নাটকের মধ্যে কোন গুরুত্ব দেওয়া হোল না—এসব কিছু আলোচনার পূর্বে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি একটু আলোচনা প্রয়োজন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনার শুরুতেই কাজী আবদুল ওদুদের একটি মন্তব্য স্মরণ করি : "নবীন লিখিয়ে ক্ষিতীশ কবির কঠিন বিদ্রূপের পাত্র হয়েছে। মানুষ হিসাবে তাকে খুবই খাটো করে আঁকা হয়েছে। সমসাময়িক অতি আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে হয়ত এমন ধারণাই কবির হয়েছিল।"[২] 'হয়ত' শব্দ প্রয়োগে কবির প্রতি সংশয়াত্মক আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে নাট্যকারকে ধরা হয়নি।

মনে হয় সমসাময়িক অতি-আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে কবির এমন ধারণা ছিল। এর শুরু 'শেষের কবিতা' থেকেই। শেষের কবিতার কাঠামো লক্ষ্য করা যাক্। অমিত রে ইংরেজী জানা একজন পাঠক এবং সমালোচক। উপন্যাসিক তার পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে : "অমিতকে আমি পছন্দ করি। খাসা ছেলে। আমি নবীন লেখক, সংখ্যায় পাঠক স্বল্প, যোগ্যতায় তাদের সকলের সেরা অমিত। আমার লেখার ঠাট-ঠমকটা ওর চোখে খুব লেগেছে। ওর বিশ্বাস, আমাদের দেশের সাহিত্য বাজারে যাদের নাম আছে তাদের স্টাইল নেই। জীব সৃষ্টিতে উট জন্তুটা যেমন, এই লেখকদের রচনাও তেমনি ঘাড়ে-গর্দানে সামনে পিছনে পিঠে পেটে বেখাপ চালটা চিলে নড়বড়ে, বাংলা সাহিত্যের মতো ন্যাড়া ফ্যাকাশে মরুভূমিতেই তার চলন।" সমালোচকদের কাছে সময় থাকতে বলে রাখা ভালো মতটা আমার নয়।

অমিত বলে "ফ্যাশানটা হল মুখোশ, স্টাইলটা হল মুখশ্রী। ওর মতে যারা সাহিত্যের ওমরাও দলের যারা নিজের মন রেখে চলে, স্টাইল তাদেরই। আর যারা আমলা দলের, দশের মান রাখা যাদের ব্যবসা, ফ্যাশান তাদেরই।"

রবীন্দ্রনাথ অমিতের মাধ্যমে আধুনিক সাহিত্যিকদের ধারণায় প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের সাহিত্যের বাজারে যে স্টাইল নেই সে কথা জানিয়ে দিলেন সহজেই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'-এ বঙ্কিমের স্টাইল দীপ্তি পাচ্ছে, অনুরূপ ভাবে তাঁর নসিরামের 'মনোমোহনের মোহনবাগানে' বঙ্কিমি ফ্যাসান এসে বঙ্কিমচন্দ্রকে একেবারে মাটি করে দিয়েছে। প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের পাশাপাশি কল্লোল যুগের সাহিত্যিকরা কলম ধরেছিলেন, তা যে কবির উষ্মার কারণ সে কথা অমিতের মুখেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। বালিগঞ্জের সাহিত্য সভায় অমিতের সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছিল আলোচনার বিষয়। সভাপতির বক্তব্য : রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে কড়া নালিশ এই যে বুড়ো ওআর্ড্‌স্‌ওআর্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি-অন্যায় রকম বেঁচে আছে। যম বাতি নিবিয়ে দেবার জন্যে থেকে থেকে ফরাস পাঠায়, তবু

লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও চৌকির হাতা আঁকড়িয়ে থাকে। ও যদি মানে মানে সরেই না পড়ে আমাদের কর্তব্য ওর সভা ছেড়ে দল বেঁধে উঠে আসা।··· রবি ঠাকুরের দলেই এই অবৈধ ষড়যন্ত্র আমি পারিকের কাছে প্রকাশ করে দেব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। রবি ঠাকুর কেবল চলে যাবার কথা বলে, রয়ে যাবার গান গাইতে জানে না।' ['শেষের কবিতা'] প্রসঙ্গত স্মরণীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সাহিত্যে নবত্ব আনার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। তার মানে এই না যে রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা একেবারে উড়িয়ে দিতে চাইছেন—বরং বলা যায় সাহিত্যের উদ্দেশ্য নিয়ে যে বাগ-বিতণ্ডা সৃষ্টি হয়েছে তাতে রবীন্দ্রনাথ রীতিমত ক্ষুব্ধ। সাহিত্যের আসরে তার প্রকাশ না ঘটলেই এইসব উপমা ও শব্দ প্রত্যয়ে তাঁর মানসিকতার পূর্ণ-চিত্র উদ্ঘাটিত হয় সহজেই।

'সাহিত্য ধর্ম' [১৩৩৪ শ্রাবণ, বিচিত্রা] ও 'সাহিত্যে নবত্ব' [প্রবাসী, ১৩৪০, অগ্রহায়ণ] ন'বৎসরের ব্যবধানে এই দুটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ধর্ম কী হওয়া উচিত এবং অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য স্মরণীয়ঃ "সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখনকার কেউ কেউ মনে করছেন নিত্য পদার্থ ; ভুলে যান, বা নিত্যতা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে সেইটাই নিত্য, যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য।·· এই ল্যাঙট্ পরা গুলি-পাকানো ধুলো মাথা আধুনিকতারই একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি হোলি খেলার দিনে চিৎপুর রোডে। সেই খেলায় আবীর নেই, গুলাপ নেই, পিচকারি নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে রাস্তার ধুলোকে পাঁক করে তুলে তাই চীৎকার-শব্দে পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগলামি করাকেই জনসাধারণ বসন্ত-উৎসব বলে গণ্য করেছে। পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ, রাঙিন করা নয়।···" আধুনিক সাহিত্য যে মানুষের মনে মলিনতা আনছে, তা স্পষ্টভাবেই এই প্রবন্ধে ব্যক্ত। শুধু তাই নয়, চলতি সাহিত্য যে সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য বেদনা নিয়ে রচিত, সে সব দারিদ্র্য বেদনার বাস্তববোধ লেখকদের নেই—এ ধারণা বিশ্বকবি নিজের মনের জগতে তৈরী করেই লিখলেন, 'অন্যান্য সকল বেদনার মতোই সাহিত্যে দারিদ্র্য বেদনারও যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু ওটার ব্যবহার একটা ভঙ্গিমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে—যখন তখন সেই প্রয়াসের মধ্যে লেখকেরই শক্তির দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। আমরাই রিয়েলিটির সঙ্গে কারবার করে থাকি, আমরাই জানি কাকে বলে লাইফ, এই আস্ফালন করবার ওটা একটা সহজ ও চলতি প্রেসকিপসনের মতো হয়ে উঠেছে। অথচ এঁদের মধ্যে অনেককেই দেখা যায় নিজেদের

জীবনযাত্রায় দরিদ্রনারায়ণ'-এর ভোগের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই রাখেননি— ভালোরকম উপার্জনও করেন, সুখে স্বচ্ছন্দেও থাকেন—দেশের দারিদ্র্যকে এঁরা কেবল নব্য সাহিত্যের নূতনত্বের ঝাঁজ বাড়াবার জন্যে সর্বদাই ঝাল-মসলার ব্যবহার করেন। এই ভাবুকতার কারি-পাউডার যোগে একটা কৃত্রিম সস্তা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে।' এই কৃত্রিম ও সস্তা সাহিত্য যে আধুনিক সাহিত্যিকরা সৃষ্টি করে চলেছেন এর বিরুদ্ধে নতুন করে তিনি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হননি—শুধুমাত্র সাহিত্যতত্ত্বের আড়ালে তাঁর উষ্মার প্রকাশ ঘটেছে। শুধু তাই নয়, যৌনতা বা বাস্তবতার নামে সাহিত্যের মধ্যে যে একটা অতি-আধুনিক চিত্র প্রকাশ লাভ করেছে—তার বিরুদ্ধেও কবি সচেতন। বিচিত্রা'র ১৩৩৪-এর শ্রাবণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ধর্মের পর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ভাদ্র সংখ্যায় 'সাহিত্যধর্মের সীমানা', আশ্বিন সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্র বাগচী 'সাহিত্যধর্মের সীমানা বিচার' অগ্রহায়ণ সংখ্যায় আবার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 'সাহিত্য ধর্মের সীমানায়' বিচার-এর উত্তর দেন। দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে। 'শনিবারের চিঠি'তে সজনীকান্ত দাস আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনার বিশেষ বিশেষ অংশ সংকলন করে 'মণিমুক্তা' নামে কিছুকাল প্রকাশ করছিলেন এতে আধুনিক সাহিত্যিকরা বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। এর মধ্যে সমসাময়িক সাহিত্যে আদর্শ-অনাদর্শ শ্লীলতা-অশ্লীলতা প্রকাশই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে আব্রুতা বে-আব্রুতা নিয়ে আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি যে বিরূপ সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র 'বঙ্গবাণী" [১৩৩৪ আশ্বিন] পত্রিকায় লিখলেন "কবি ত থাকেন বারোমাসের মধ্যে তেরো মাস বিলাতে। কি জানেন তিনি। কে আছে তোমাদের খড়্গহস্তা শুচিধর্মী অনুরূপা, আর কে আছে তোমাদের বংশী-ধারী অশুচি ধর্মী শৈলজা—প্রেমেন্দ্র—নজরুল—কল্লোল কালি কলমের দল ? কি করিয়া জানিবেন তিনি, কবে কোন্ মহীয়সী জননী অতি আধুনিক সাহিত্যিক দলন করিতে ভবিষ্যৎ মায়ের সূতিকা গৃহেই সন্তান বধের সদুপদেশ দিয়া নৈতিক উচ্ছ্বাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, আর কবে শৈলজানন্দ কুলি-মজুরের নৈতিক হীনতার গল্প লিখিয়া আভিজাত্য খোয়াইয়া বসিয়াছেন ? এ সকল অধ্যয়ন করিবার মত সময়, ধৈর্য্য এবং প্রবৃত্তি কোনটাই কবির নাই, তাঁহার অনেক কাজ। দৈবাৎ এক-আধটা টুকরো-টাকরা লেখা লেখা আছে তাঁহার চোখে পড়িয়াছে. তাহা হইতেও তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বে-আব্রুতা এবং আভিজাত্য দুই-ই গিয়াছে। শুরু হইয়াছে চিৎপুর রোডের খচো-খচো-খচকায় যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃ পুনঃ আবর্তিত গর্জ্জন ! আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কবির এত বড় অবিচারে শুধু নরেশচন্দ্রের নয় আমারও বিস্ময় ও ব্যথার অবধি নাই।"

এখানেই 'বাঁশরীর' নাটকের মূল সুর। আধুনিক সাহিত্যিকদের বিপক্ষে পরোক্ষভাবে কিছু বক্তব্য রাখার জন্যেই বাঁশরীর সৃষ্টি। সমালোচকগণ অবশ্য এই নাটকের মৌলিকতা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন; তাঁরা মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে ভালবাসাকে প্রেমের বীর্যের মধ্যে মুক্তি দিয়েছেন এবং কর্তব্যের আইডিয়ালকে প্রেমের আনন্দে পূর্ণ করে মধুর করে তুলেছেন। কবি দেখিয়েছেন—কর্তব্যবিমুখ স্বার্থপর ভালবাসা যেমন অসম্পূর্ণ তেমনি প্রেমহীন কর্তব্যও অসম্পূর্ণ। তিনি সকলের গলায় 'ভালোবাসার সুত্র গেঁথে ব্রতের হার' পরিয়ে দিয়েছেন। আর সেই জন্যেই দেখা যায়ঃ

বাঁশরি ভালবাসার প্রতিনিধি—ভালবাসা আসক্তিমুক্ত হয়েই প্রেমে রূপান্তরিত।

পুরন্দর—কর্তব্যের প্রতিনিধি—আসক্তিমুক্ত হয়েই প্রেমকে কর্তব্যের প্রেরণা শক্তি বলে মনে করে নিয়েছে

সোমশংকর—পুরন্দরের অনুগামী

এবং পুরন্দর শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করেছেন যে কর্তব্যের দুর্গম পথের পাথেয় যে শক্তি তা আনন্দেরই দান। 'প্রেমে মুক্তি' 'ভালোবাসায় বন্ধন' এই তত্ত্বই বাঁশরি নাটকের উপজীব্য বিষয়। সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে বাঁশরী–দুই বোন—মালঞ্চ একই সুরে বাঁধা। 'বাঁশরি'তে বাঁশরি ক্ষিতীশকে বিবাহ না করে করেছে সোমশংকরকে, কিন্তু 'দুই বোন'-এ শর্মিলা স্বামী শশাঙ্কের জন্যেই বোন ঊর্মিকে ধরে রাখতে চাইলো, অন্যদিকে 'মালঞ্চে'র নীরজা সরলাকে আদৌ চায় না বলেই তিলে তিলে সঞ্চিত ব্যথার অভিব্যক্তি জানাতে গিয়ে করুণতম পরিণতির দিকে চলেছে। ভালবাসা এবং প্রেমের সূক্ষ্ম রেখা টানা হয়েছে ঐ উপন্যাসগুলি এবং গদ্য নাটিকাতে। যদিও এর শুরু 'শেষের কবিতা'য়, সমাপ্তি 'চার অধ্যায়'-এ।

'শেষের কবিতা'র নিবারণ চক্রবর্তী জানিয়েছিলেন, 'আনিলাম / অপরিচিতের / নাম ধরণীতে / পরিচিত জনতার সারণীতে'। সেদিন রবি ঠাকুরের দল বিশেষভাবে উত্তেজিত হলেও কিছুই তাদের করণীয় ছিল না কারণ, এই নব্য সাহিত্যিকরা পরিচিত জনতার মধ্যে অপরিচিতের নাম নিয়ে এসেছেন। একজন আধুনিক সাহিত্যিক ক্ষিতীশকে ঝাঁঝালো ভাষায় বাঁশরি জানাচ্ছে, "ক্ষিতীশ, সাহিত্যে তুমি নূতন ফ্যাশানের ধূমকেতু বললেই হয়। জ্বলন্ত লেজের ঝাপটায় পুরোনো কায়দাকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছ আকাশ থেকে।"

স্মরণীয় শেষের কবিতায় অমিত বলেছে 'ফ্যাশানটাই মুখোশ, স্টাইলই মুখশ্রী', বাঁশরিতে আধুনিকরা সেই ফ্যাশানের ধূমকেতু বলেই চিহ্নিত।

'বাঁশরি' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে একজন প্রখ্যাত সমালোচকের উক্তি স্মরণ করা যাক। 'একদা বাঙলার অতি আধুনিক সাহিত্যিকদের মহলে রব উঠিয়াছিল যে, রবীন্দ্র সাহিত্যে বাস্তবতা নাই, তাতে মন-ভোলানো কথা আছে এবং মায়া আছে, আধুনিকতার মর্জি প্রকাশ করিবার মত কোন সম্পদ নাই। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঘোষণা জানাইয়াছেন। এই অভিযোগের সুর 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে পাই। শেষের কবিতার অমিত অভিযোগ জানায়, 'রবি ঠাকুর কেবল চলে যাবার কথা বলে 'রয়ে যাবার গান গাইতে জানে না।'[৩]

'বাঁশরি' নাটকে তাই রবীন্দ্রনাথ সমকালীন সাহিত্যে বাস্তবতার নামে এক ধরনের ফাঁকা চোখ-ভোলানো পট দেখানো হচ্ছে বলে মনে ক'রে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। সমকালে শৈলজানন্দের 'কয়লাকুটির গল্প', যুবনাশ্বের 'পটলডাঙার পাঁচালী', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' বাস্তবতার স্বাক্ষর-বাহী গল্প ও উপন্যাস এবং নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের গল্পগুলিতে নর-নারীর শরীর নিয়ে সত্যিকারের বীক্ষণ শুরু হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, নাতনীর যৌবনের তাতে হাত সেঁকে নেন ঠাকুরমা, ['শীতের প্রশ্ন বসন্তের উত্তর'] বা প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখলেন, 'মেদ মাংস হাড় মজ্জা কাম ক্রোধ সহ সমস্ত মানুষের মানে চাই, ['মানে' / 'প্রথমা']। আর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখলেন কল্লোলের পাতায়, 'পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো, / সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর, / আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ন আলো / যুগ সূর্য ম্লান তার কাছে'। ইত্যাদি। এ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাশীলভাব নিয়েই বহু সাহিত্যিকের যাত্রা শুরু। শরৎ চন্দ্র বলেছেন, 'বাঙলা সাহিত্যসেবীদের মাঝে এমন কেহই নাই যে, তাঁহাকে মনে মনে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। আধুনিক সাহিত্যের অমঙ্গল আশংকায় যাহারা তাঁহার কানের কাছে 'গুরুদেব' বলিয়া অহরহ বিলাপ করিতেছে, তাহাদের কাহারও চেয়েই ইঁহারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় খাটো নহে।" ['সাহিত্যের রীতিনীতি']। অবশ্য নানাভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে লাঞ্ছিত হলেন। অচিন্ত্যকুমার তাঁর কল্লোল যুগ' বইতে বললেন, 'সবচেয়ে লাঞ্ছনা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। সে এক হীনতম ইতিহাস' ['কল্লোল যুগ' পৃঃ ২৯৩ এম. সি. সরকার ১৩৭২]।

'বাঁশরি' নাটকে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ ঃ

[১] সাহিত্যের সদর বাজারের কথা হচ্ছে না। তোমরা যে নতুন বাজারের চলতি দরে ব্যবসায় চালাচ্ছো সেও একটা বাজার। তার বাইরে যেতে তোমার সাহস নেই পাছে মালের গুমোর কমে। এবারে তারই প্রমাণ পেলুম তোমার এই হালের বইটাতে যার নাম দিয়েছ 'বেমানান'। সস্তায় পাঠক ভোলাবার লোভ তোমার পুরো পরিমানেই আছে। মাঝারি লেখকরা মরে ঐ লোভে। তোমার এই বইটাকে বলি আধুনিকতার বটতলায় ছাপা, খেলো আধুনিকতা।

[২] যখন কলেজে পড়া মুখস্থ করতে, তখন শিখেছিলে রসাত্মক বাক্যই কাব্য; এখন সাবালক হয়েছ তবু ঐ কথাটা পুরিয়ে নিতে পারলে না যে সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হলেই তাকে বলে সাহিত্য।

[৩] অশ্বত্থামার ছেলেবেলার গল্প পড়েছ। ধনীর ছেলেকে দুধ খেতে দেখে, যখন সে কান্না ধরলো, তাকে পিটুলি গুলে খেতে দেওয়া হোল, দুহাত তুলে নাচতে লাগল দুধ খেয়েছি বলে।

[৪] বানিয়ে-তোলা লেখা তোমার, বই পড়ে লেখা। জীবনে যার সত্যের পরিচয় আছে, তার অমন লেখা বিস্বাদ লাগে।

[৫] বাঙলা উপন্যাসে নিউমার্কেটের রাস্তা খুলেছ নিজের জোরে, আলকাতরা ঢেলে। এখানে পুতুল নাচের রাস্তাটা বের করতে তোমারও অফিসিয়াল গাইড চাই। লোকে হাসবে যে।

প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে ক্ষিতীশ বাঁশরিকে প্রশ্ন করেছে, তার অর্থাৎ সমালোচকের সত্যের সঙ্গে পরিচয় আছে কিনা। উত্তরে বাঁশরি যা জানিয়েছে তাতে অতি-আধুনিক সাহিত্যিকের কলমের জোর আছে বলে স্বীকার করা হয়েছে। বাঁশরি আরো বলেছে যে তার সত্যের সঙ্গে পরিচয় আছে, কিন্তু লেখবার শক্তি নেই। সবচেয়ে দুঃখের কথা ক্ষিতীশের লেখবার শক্তি থাকলেও প্রকৃত সত্যের সঙ্গে তার কোন পরিচয় নেই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন, যেহেতু সাহিত্য ও ললিত কলার কাজই প্রকাশ, এইজন্যে তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় করে আমাদের মনকে সত্যের স্বাদ দেওয়াই তার প্রধান কাজ। এই স্বাদটা হচ্ছে একের স্বাদ, অসীমের স্বাদ। আমি ব্যক্তিগত আমি, এটা হল আমার সীমার দিকের কথা, এখানে আমি ব্যাপক একের থেকে বিচ্ছিন্ন, আমি মানুষ, এটা হল আমার অসীমের অভিমুখী কথা, এখানে আমি বিরাট একের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রকাশ যান। ['সত্য ও তথ্য' / সাহিত্যের পথে] এবং এই বোধ নিয়েই তিনি যদি মনে করেন যে আধুনিক সাহিত্যের বিষয় যে সাধারণ মানুষ তার মধ্যে প্রকৃত সত্যের স্বাদ নেই তাহলে একটা বিপর্যয় ঘটারই সম্ভাবনা। তাই তিনি প্রথম থেকেই 'নববার্তা' কাগজের

গল্প লিখিয়ে ক্ষিতীশের 'বেমানান' গল্প বই যে বিলিতি মার্কা নব্য বাঙালীকে মুচড়ে মুচড়ে নিংড়চ্ছে সেকথা জানাতে ভোলেননি। ক্ষিতীশের লেখক হিসেবে শক্তি আছে, কিন্তু বাঁশরির মতে প্রকৃত সত্যের সঙ্গে পরিচয় না থাকায় তার গল্পগুলি 'পিটুলি গোলা জল খাইয়ে পাঠক শিশুদের নাচাচ্ছে।'

সোমশংকর হাতছাড়া হবার পর বাঁশরির শখ গেল নখী—দন্তী গোছের একটা লেখক পোষবার। ক্ষিতীশ সেই লেখক। এই 'নখী দন্তী' ও 'পোষবার' শব্দ ব্যবহার করে নাট্যকার যে এক শ্বাপদ জন্তুর চিত্রকল্পের উল্লেখ করেছেন তা সর্বজনগ্রাহ্য সন্দেহ নেই। আধুনিক সাহিত্যকদের প্রতি এর চেয়ে বেশী অশালীন মন্তব্য আর কি হতে পারে?

ক্ষিতীশ অবশ্য ছাড়বার পাত্র নন, তার মুখে যখন শুনি, 'দেবী, আমরা জোগাই রসাত্মক বাক্য, তা নিয়ে তর্ক ওঠে; আপনারা দেন রাসাত্মক বস্তু, ওটা অন্তরে গ্রহণ করতে মতান্তর ঘটে না। তখন অর্চনার মুখে নাট্যকার এক সার্থক বাক্য দিয়েছেন যাতে ক্ষিতীশকে সম্মান দেওয়া যায়। অর্চনা বলেছে, 'সাতজন্ম উপোস করে থাকলেও আমার মুখ দিয়ে এমন ঝকঝকে কথাটা বেরত না।' অথচ সবচেয়ে মজার কথা এই যে নাট্যকার 'রিয়েলিজম' কথাটিকে চরম করে তোলবার জন্যে এমন একটি দৃশ্যের কাল্পনিক অবতারণা করলেন যা রীতিমতভাবে বিশ্বকবির পক্ষে অসম্ভব বলেই মনে হয়। তিনি ক্ষিতীশের 'বেমানান' গল্পের সমালোচনায়—অর্চনার মুখে বসিয়েছেন, "এই পরশু দিন পড়েছি আপনার 'বেমানান' গল্পটি।···রক্তের যোগ না থাকলে অমন অদ্ভুত সৃষ্টি বানানো যায় না। ঐ যে—যে জায়গাটাতে মিস্টার কিষেণ—গাট্টা বি. এ. কাণ্টাব মিস লোটিকার পিঠের দিকের জামার ফাঁক দিয়ে আংটি ফেলে দিয়ে খানাতল্লাশির দাবী করে হো হো বাধিয়ে দিলে। আমার বন্ধুরা সবাই পড়ে বললে ম্যাচলেস—বঙ্গ সাহিত্যে—এ জায়গাটায় মেলে না, একটু পোড়া কাঠিও না। আপনার লেখা ভয়ানক রিয়েলিস্টিক ক্ষিতীশবাবু। ভয় হয় আপনার সামনে দাঁড়াতে'।

অর্চনার তীব্র সমালোচনার পর লীলাও সমালোচনা শুরু করেছে। যতীন ঘটকের লেখা 'রক্তজবা' বইটা ক্ষিতীশের বলে ধরে নিয়ে জানায়, এমন ওরিজিন্যাল আইডিয়া, এমন ঝকঝকে ভাষা, এমন চরিত্র চিত্র আপনার আর কোন লেখায় দেখিনি। আপনার নিজের রচনাকেও বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছেন। ওতে আপনার মুদ্রাদোষগুলি নেই, · ,

বাঁশরি সুষমাকে বলে, ক্ষিতীশবাবু ন্যাচার‍্যাল হিস্ট্রি লেখেন গল্পের ছাঁচে। যেখানটা জানা নেই, দগদগে রঙের আমদানি সমুদ্রের ওপার থেকে।

"সমকালের পাশ্চাত্য সাহিত্য কলকাতার আধুনিক সাহিত্যিকদের আনন্দ দিয়েছে—অনুবাদ চলেছে জোর কদমে। এমনকি ও'দের প্রভাবও লেখায় ফুটে উঠেছে কোন কোন ক্ষেত্রে। এই ইঙ্গিতই বাঁশরির মুখে বসিয়েছেন নাট্যকার। এর মাঝে সোমশংকরকে না পেয়ে বাঁশরি ক্ষিতীশকে মনে মনে নিজেকে উৎসর্গ করে জানিয়েছে সন্ন্যাসীর কথা—প্রেমে মুক্ত মানুষের আর বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে জানিয়েছে, 'সীতা ভাবলেন, দেব চরিত্র রামচন্দ্র উদ্ধার করবেন রাবণের হাত থেকে। শেষকালে মানব-প্রকৃতি চাইলেন তাঁকে আগুনে পোড়াতে। একেই বলে রিয়ালিজম্, নোংরামিকে নয়। লেখো লেখো, দেরি কোরো না, লেখো এমন ভাষায় যা হৃৎপিণ্ডের শিরা ছেঁড়া ভাষা। পাঠকেরা চমকে উঠে দেখুক, এতদিন পরে বাংলার দুর্বল সাহিত্যে এমন একটা লেখা ফেটে বেরোল যা ঝোড়ো মেঘের বুক ভাঙা সূর্যাস্তের রাগী আলোর মতো।' এখানে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দুর্বলতা দেখিয়ে ক্ষিতীশকে দিয়ে স্থূল রসিকতা করিয়ে বাঁশরিকে দিয়ে কথার চাবুক মেরেছেন। পুরন্দর—সোমশংকর প্রসঙ্গে বাঁশরি বলেছে, 'রাখো তোমার ছেলেমি। ভুল করেছি তোমাকে নিয়ে। যে মানুষ খাঁটি লিখিয়ে তার সামনে যখন দেখা দিয়েছে সৃষ্টি কল্পনার এমন একটা জীবন্ত আদর্শ দররর্ করছে যার নাড়ী, তার মুখ দিয়ে কি বেরোয় খেলো কথা। কেমন করে জানাব তোমাকে। আমি যে প্রত্যক্ষ দেখছি একটা মহা রচনার পূর্বরাগ, শুনছি তার অন্তহীন নীরস কান্না।' ইত্যাদি। এক মুহূর্তে ক্ষিতীশকে নিয়ে বাঁশরির কল্পনার জগৎ ধূসর হয়ে যায়। এরপর বাঁশরি ভালোবাসার নিলামে সর্বোচ্চ দর পেয়ে সোমশংকরকে ফিরে পায়। নাটকে বাঁশরি একটি উজ্জ্বল চরিত্র। কিন্তু ক্ষিতীশ তার চরিত্রকে উজ্জ্বল রাখার পক্ষে সহায়ক বলেই তাকে সরিয়ে রাখা ঠিক নয়। নাটকের শেষ পর্যন্ত কিন্তু ক্ষিতীশ কোন গুরুত্ব পায় না। ক্ষিতীশের প্রতি বাঁশরির পত্র যে কত মর্মান্তিক তা লক্ষণীয়ঃ 'তোমার ভাগ্য ভালো, ফাঁড়া কেটে গেল, আমারও বিবাহের আসন্ন আশংকাটা সম্পূর্ণ লোপ করে দিলুম। ভালোবাসার নিলামে সর্বোচ্চ দর পেয়েছি, তোমার ডাক সে পর্যন্ত পোঁছত না। অবশ্য অন্য-কোন সান্ত্বনার সুযোগ উপস্থিত মত যদি না জোটে তবে বই লেখো। আশাকরি এই সত্যের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে। তোমার এই লেখায় বাঁশরির প্রতি দয়ার দরকার হবে না। আত্ম-হত্যার এক পেঁঠে—পা বাড়িয়েই সে ফিরে এসেছে।' পত্র বিশ্লেষণে দাঁড়ায় [ক] বাঁশরি ক্ষিতীশের চেয়ে সোমশংকরের কাছে স্থিতি পেয়েছে বেশি, [খ] সান্ত্বনার জন্য বই লিখুক ক্ষিতীশ, [গ] তাতে সত্যের সঙ্গে পরিচয় হবে, [ঘ] বাঁশরির ক্ষিতীশকে বিবাহ করার অর্থ 'আত্মহত্যা'।

••• · ৩ •••

ঠিক ঐ সময়ে বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় পর পর দুটি বারোয়ারী উপন্যাস রচিত। সে দুটি হোল 'বিসর্পিল' এবং 'বনশ্রী'। দুটিরই রচনাকাল ১৯৩৪। দুটিরই রচয়িতা প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধ--অচিন্ত্য, কল্লোলের ত্রয়ী হিসেবে যাঁরা চিহ্নিত। কথাশিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্র মনে করেন যে রবীন্দ্রনাথের এই নাটকের প্রতিবাদেই তাঁরা 'বনশ্রী' উপন্যাসটিই লিখেছিলেন। [ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বছর বারো-চোদ্দ পূর্বে আমাকে বলেছিলেন 'বিসর্পিল' উপন্যাসটিই প্রতিবাদস্বরূপই লেখা হয়েছিল, পরে অবশ্য 'বনশ্রীর' কথা বললেন মৃত্যুর বছর দুই পূর্বে। এই উপন্যাস দুটি সম্পর্কে বলতে পারতেন সাহিত্যিক ভবানী মুখোপাধ্যায় এবং বুদ্ধদেব বসুর সহধর্মিণী সাহিত্যিক প্রতিভা বসু। আমার মনে হয় দুটি উপন্যাসই এই প্রসঙ্গে রচিত হয়েছিল।]

'বিসর্পিল' [১৯৩৪] উপন্যাসটি বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় দু একজন সমালোচকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। রবীন্দ্রনাথ অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের যেমন ভাবে চাবুক মেরেছিলেন এরাঁও অনুরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিককে ছোট করে দেখালেন।

গল্পের বিষয়বস্তু একটু বলে নেওয়া যাক। সাহিত্যসভায় তিরিশোর্দ্ধ সাহিত্যিক সিতিকণ্ঠ এসে গল্প পাঠ করলেন। নীচুতলার মানুষের জীবনায়ন গল্পের বিষয়। গল্পপাঠ শেষ হলে শুরু হোল সমালোচনার পালা। উপস্থিত একজন জানায়, এসব গল্প অত্যন্ত insincere, ভাবের খানিকটা ধোঁয়া ছাড়া আর কিছু নয়। মোটরে করে বস্তি ঘুরে এলেই realism হলোনা। লেখায় চাই দেশের মাটির সঙ্গে নাড়ীর যোগ, চাই মানুষের জন্য সত্যিকারের দরদ।' এই আসরে আলোচনায় অংশ নিয়ে একজন জানালো, তাহলে সিতিকণ্ঠবাবু কি কলম ছেড়ে সত্যিকারের গাঁইতি নেবেন ? অন্য একজন বলে, আসলে দেখতে হবে লেখাটা সত্যিকারের গল্প হয়েছে কিনা। রবীন্দ্রনাথও মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত না হলেও তাঁর গল্প সার্থক গল্প হয়েছে। সুতরাং এখানে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক সিতি-কণ্ঠের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগ না থাকলেও তাঁর লেখা গল্প 'গল্প হয়েছে' এটাই বড় কথা! ঠিক এই সভায় নবীন লেখক রথী সিতিকণ্ঠকে ধরে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। এই সাহিত্য সভারই সিতিকণ্ঠের সঙ্গে রথীর পরিচয়। রথী গ্রামের ছেলে। কলকাতায় বি এ. পড়ে। ঘর ভাড়া করে থাকে। সিতিকণ্ঠ মেসে থাকে। জঙ্গীপুরে বাড়ী। তাঁর সংসারের দারিদ্র্য এখনো আছে, এ কথা প্রথম পরিচয়েই জানতে পারে রথী। রথী

তাঁর একটা উপন্যাস ছাপার জন্য সিতির সাহায্য চায়। এই সুযোগে সিতি রথীকে জানিয়ে দেয় যে সাহিত্যিকরা স্রষ্টা, অবিনশ্বর। আর প্রাণের চেয়ে প্রতিভাই বড়।

রথী সিতিকণ্ঠের মেসে আসে এবং কুৎসিত পরিবেশ দেখে ব্যথিত হয়। সে সিতিকণ্ঠের জন্য সব খরচ করতে বলে। এখানে সে সিতিকণ্ঠের কাছে জানতে পারে এক, সাহিত্যের পক্ষে companionship একটা খুব বড় জিনিষ। দুই, দুঃখের কি আর শেষ আছে ভাই। তিন, চুন বাদ দিয়ে পান খাওয়াটা আমাদের পোষাবে না। রথী যখন তার সদ্য লিখিত উপন্যাস 'ভাঙা আয়না'র পাণ্ডুলিপি সিতিকণ্ঠের হাতে দিল তখন সিতির চোখে এক প্রখর হিংস্র পিপাসা। সহজ সরল রথী সাদা কাগজে উপন্যাসের গ্রন্থ-স্বত্বও লিখে দেয়। ঠিক এই প্রসঙ্গে সিতির কটি কথা স্মরণীয়ঃ এক, আয়না যতদিন অটুট থাকে, ততদিন মুখ দেখে নাও। দুই, Business is Business. তিন, যুদ্ধ করতে এসেছি, অথচ হাতে নেই অস্ত্র, চীনেদের মতো সম্বল শুধু একটা খন্তা।

তাই তার ভালো পেনটিও রথী সিতিকেই দান করে দেয়।

এমনিভাবে সিতি-রথীর সম্পর্ক যখন নিবিড় হয়েছে, তখন রথী সিতিকে তার নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছে। মিথ্যে করে সিতি জানিয়েছে যে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি প্রেসে দিয়েছে। এবং রথীর বিবেক জাগাবার জন্য বলে, 'একেই বলে অসত্য থেকে সত্যে চলে আসা, মৃত্যু থেকে অমৃতে।' ঔপন্যাসিকগণ এই দুজনের পক্ষে যে উপমা ব্যবহার করেছেন তা আদৌ সুখকর নয়। হাইয়ের পরে যেমন তুড়িটি, সিতিকণ্ঠের পিছনে চলেছে রথী। পেয়ালার যেমন হাতল, জুতোয় যেমন সুখতলা।...নদীতে গাধা-বোট চলতে দেখলে যেমন মনে করতে হয়, জাহাজ তাকে টেনে নিয়ে চলেছে, তেমনি রথীকে দেখলে নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবা যায়, সামনে আছে সিতিকণ্ঠ ...ধোঁয়া দেখে যেমন মনে করা যায় আগুন, তেমনি সিতিকণ্ঠকে দেখে সিদ্ধান্ত করা যায় এখুনি হবে রথীর অভ্যুদয়। থিয়োরেমের একটা করোনারির মতো রথী যেন সিতিকণ্ঠেরই একটা অনায়াস প্রতিপাদন। মিনিটের কাঁটার সঙ্গে সে লেগে আছে সিতিকণ্ঠের পিছনে। আলোছায়ার মতো দুজন থাকলেও সিতিকণ্ঠের মনের সর্পিলগতি বুঝতে পারে না রথী। ধীরে ধীরে রথীর সোনার বোতাম সিতির কাছে চলে যায়। এমনকি দেখা যায় কলেজ স্ট্রীটে বই পাড়ায় গিয়ে তার র‍্যাপারের ভেতরে কয়েকটি বই সিতি নিয়ে এসে মন্তব্য করে, গল্প বইয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে দু একটা ভালো বই পাওয়া যায়। আপাতত রথী সিতিকণ্ঠের এত ভক্ত যে, সে

তার ছল কিছুতেই বুঝতে পারে না। এমনকি রথীর ভালোবাসার পাত্রা মাধুরীর কাছ থেকে আসা চিঠি সিতি ফেরত পাঠায় এবং মাধুরী মনের ক্ষোভেই রথীকে অপমান করে। তারপর সিতিকণ্ঠ রথীকে নিয়ে যায় চৌরঙ্গীর বারবণিতা বীণার বাড়ীতে। রথী এতে মাধুরীর অপমান হবে মনে করে চলে আসে। এদিকে রথীকে লেখা বীণার একটি চিঠি মাধুরীর কাছে পাঠিয়ে মাধুরীর সঙ্গে রথীর বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্য জঘন্যতম কাজ করতে সিতিকণ্ঠের বাধে না। উপন্যাসের এখানেই পরিসমাপ্তি। অর্থ-লোলুপতা, চৌর্য বৃত্তি, পরশ্রীকাতরতা বিকৃত যৌনক্ষুধা প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের মধ্যে দেখানো হয়েছে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'মাধুরীর সঙ্গে রথীর বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য সিতিকণ্ঠের প্রাণান্ত চেষ্টা আমাদিগকে Jago-র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়' সে যাই হোক তাঁর মতে, 'বিসর্পিল রচনায় বুদ্ধদেব বসুর প্রভাব কম, অচিন্ত্যকুমারের পরিকল্পনায় কৃতিত্ব এবং বাস্তব প্রবণতা ও একপ্রকার শুষ্ক সংযত ব্যঙ্গের সর্বব্যাপী অস্তিত্বের জন্য দায়িত্ব বোধহয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের।'

'বাঁশরি' নাটকের 'নববার্তা' কাগজের গল্প লিখিয়ে ক্ষিতীশ যেমন সমালোচনার মুখোমুখি তেমনি সিতিকণ্ঠও। 'বনশ্রী' [১৯৩৪] উপন্যাসেও অনুরূপভাবে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে। নাট্যকার বরুণ হালদার এবং নাটকের নায়িকা বনশ্রী চৌধুরী পরস্পরকে ভালোবাসে। থিয়েটারকে কেন্দ্র করে রমলা, সুমিতা, পরিমল এবং বিহারীবাবুর মধ্যে আর্ট ও সাহিত্য নিয়ে নানা আলোচনাও হয়। উদীয়মান লেখক মৃন্ময় সোম এদের মাঝে একদিন আমন্ত্রিত হয়, কিন্তু বরুণ তা ভালো চোখে দেখে না। নবীন লেখক বনশ্রীর ব্যবহারে এবং নিভৃত আলাপনে নিজেকে ধন্য মনে করে; ধীরে ধীরে বনশ্রী মৃন্ময়ের উপন্যাস ও গল্প শোনার জন্য উন্মুখ হয় এবং মৃন্ময়ের প্রতি যেন বিশেষ অনুরক্ত হয়ে পড়ে। মৃন্ময় আদর্শ লেখক, লেখাই তার তপস্যা। মৃন্ময়ের চাকরী নেই, আয়ও খুব একটা বেশী নেই, দারিদ্র্যের কশাঘাতে জীবন জর্জরিত। এদিকে বনশ্রী বরুণের থেকে দূরে সরে গেলেও মৃন্ময়ের দারিদ্র্য দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে এবং তাকে বিয়ে করে সুখী হওয়ায় পরিকল্পনা মন থেকে মুছে দেয়। জানিয়ে দেয় বরুণের সঙ্গে তার বিয়ের দিনে সে যেন উপস্থিত না থাকে। এখানেই উপন্যাসের সমাপ্তি।

'বিসর্পিল' উপন্যাসে দেখানো হলো প্রতিষ্ঠিত লেখকের হৃদয়ের দৈন্য, মিথ্যার মরুবালি রাশি; এখানে দেখানো হোল আধুনিক লেখকের দারিদ্র্য। সে সময় দারিদ্র্য বহু সাহিত্যিকের কষ্টের কারণ হয়েছিল। তাই বরুণ-

বনশ্রীর প্রেম দিয়ে উপন্যাস শ্বরু, ম্বন্ময়-বনশ্রীর বিচ্ছেদে সমাপ্তি। বরুণ এখানে প্রতিষ্ঠিত সমৃদ্ধ নাট্যকার তাই সে বনশ্রীর প্রেম পেল, নবীন দরিদ্র লেখক ম্বন্ময় বনশ্রীর প্রেমাস্পদ হতে পারলো না। উপন্যাসে বিহারীবাবুর কথায় বোঝা যায়, যে তৎকালীন লেখকের জীবন কত বিপন্ন। 'যা দিনকাল, সাহিত্যকে Subsidiary Occupation ক'রে না নিলে চলছে না। না বাঁচবে সাহিত্য না বাঁচবে সাহিত্যিক।' কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের দারিদ্র্য[৪] এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সমৃদ্ধি ও দীনতার টানা পোড়েনে প্রেম সমৃদ্ধিকে চাইলো। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত সমৃদ্ধ সাহিত্যিকই বনশ্রীকে পেল।

'বাঁশরি' নাটকের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাট্য-প্রতিভার নতুন কোন রূপ প্রকাশিত হয়নি বরং আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি অপ্রয়োজনীয় কুৎসা প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন তিনি। আর কোন উপন্যাস বা নাটক এই দ্বন্দ্বে রচিত হয়েছিল কিনা জানি না, তবে এই দুটি উপন্যাস যে, 'বাঁশরি'র প্রতিবাদে উচ্চকিত তা একবাক্যে সত্য।

।। গ্রন্থনির্দেশ ।।

১ রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা : নীহাররঞ্জন রায় নিউএজ : ১৩৬৯ পৃঃ ৩০৮

২ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (২য়) কাজী আবদুল ওদুদ, ভারতী লাইব্রেরী ১৩৭৬ পৃঃ ৫৭২

৩ রবীন্দ্র নাট্য পরিচয়, শচীন সেন পৃঃ ৪১৪

৪. ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা, শিবরাম চক্রবর্তী আনন্দ পৃঃ ২২৪

প্রসঙ্গ ঘনাদা-মামাবাবু-পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবনের প্রথম পর্বে একটি কবিতায় যা লিখেছিলেন, তাঁর জীবনের প্রাত্যহিক কাজে, সর্বপ্রকার সাহিত্যকর্মে সেই কবিতার অনুরণন শুনতে পাই ঃ কবিতাটির শেষ স্তবক ঃ

মোদের লগ্ন-সপ্তমে ভাই রবির অট্টহাসি,
জন্ম তারকা হয়ে গেছে ধূমকেতু !
নৌকা মোদের নোঙর জানে না,
শুধু চলে স্রোতে ভাসি—
কেন যে বুঝি না, বুঝিতে চাহি না হেতু !

[সুদূরের আহ্বান / প্রথমা]

গতিশীলতাই তাঁর জীবন। জীবন দর্শন। এই জীবন দর্শনের ইঙ্গিত তাঁর বহু কবিতায়, বহু উপন্যাসে, গল্পে আমরা পেয়েছি। বর্তমান প্রসঙ্গ আলোচনায় আমরা বলতে পারি—তাঁর বোহেমীয় জীবনে ভ্রমণ পিপাসু মনের যে একটা পৃথক রোম্যান্টিকতা লুকিয়েছিল—সেটাকে ভ্রমণ কাহিনীতে রূপ দেবার বাসনা ছিল। আসলে তিনি ছিলেন কল্লোলযুগের প্রথম নম্বর বইপড়ুয়া। একথা শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর 'ঈশ্বর-পৃথিবী-ভালবাসা' গ্রন্থে জানিয়েছেন। তিনি ভুগোল-বিজ্ঞান-প্রাচীন ইতিহাস থেকে শুরু করে হালফিল নানাবিধ তত্ত্ব পড়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন। একদিকে শৈশবে জুলভার্ণ-এর কল্পবিজ্ঞান তাঁকে আকৃষ্ট করেছে, অন্যদিকে বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসা তাঁকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গিতে নিপুণ করে দিয়েছিল। তিনি যদিও মনে করতেন তাঁর প্রথম পরিচয় তিনি 'কবি', তা সত্ত্বেও তাঁর মনের মধ্যে কবিতার বাইরে সাহিত্যের নানা সৃজনশীলতার রূপ দানা বেঁধেছিল, তাই তিনি গল্প লিখেই প্রথম খ্যাতি লাভ করেছিলেন, পরে কবিতায়। 'শুধু কেরাণী' এবং 'গোপন চারিণী' তাঁকে লেখক পরিচিতি দিয়েছিল, কিন্তু যুগপৎ তিনি সাহিত্যের যে শাখাতে কলম ধরেছেন, সেই শাখাতেই মানুষের

শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। কল্লোলযুগের অন্য কোন কবির ভাগ্যে এমনটা ঘটেনি।

কবি প্রেমেন্দ্রের প্রতিটি সাহিত্য কর্মকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে তাঁর কবি সত্তারই দর্শন মেলে। কিন্তু সেই কবি ঘনাদার প্রথম গল্প 'মশা' হঠাৎই একটি পরীক্ষা করার জন্যে দেব সাহিত্য কুটীরের পূজাবার্ষিকীতে (১৯৩৭) লিখেছিলেন, এবং এ যেন সেই আসা-দেখা-জয় করা। তাই হোল। পাঠক সম্পাদক সকলেই জানেন ঘনাদার এই গল্পগুলির মধ্যে তিনি কল্পবিজ্ঞান, প্রাচীন ইতিহাস; ভূগোল-পুরাণ সবকিছু মিশেল দিয়ে ঘনাদাকে সারা বিশ্বে পরিভ্রমণ করিয়ে নিলেন। এই যে ঘনাদার ভ্রাম্যমাণ রূপটা এটা তিনি অকপটে ১৯৮৫ সালের ২৫শে আগষ্ট যুগান্তর পত্রিকায় কিন্নর রায়কে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'ভ্রমণের লেখা খুব ইন্টারেস্টিং করে লেখার ইচ্ছে আছে। আমার তো সপ্তমে রবি। শুনেছি সপ্তমে রবি থাকলে নাকি মানুষ ভ্রাম্যমান হয়। আমি সেই রবি ঘনাদাকে দিয়ে দিয়েছি।' অবশ্য ব্যাপারটাকে শুধু এত সহজে দেখলে তো হবে না, ঘনাদা শুধু ভ্রমণকারী নন, তিনি দেশে বিদেশের নানা তথ্য এবং তত্ত্ব জানেন—সেই তথ্যের ভিত্তিতে নিজে দেশের নানা সামাজিক সমস্যার সমাধান করছেন। কিশোর পাঠকদের বিশ্বাসযোগ্যতা জাগানোর জন্যে তিনি যেমন বিজ্ঞান বা কল্প বিজ্ঞানের রূপ উপস্থাপনায় একটা পদ্ধতি নিয়েছেন। গল্প বলার ঢং-এ ঘনাদাকে একটি অতিমানবিক চরিত্র হিসেবে সাজিয়েছেন। তাঁর গল্প বলার পদ্ধতি, তাঁর খাওয়া, তাঁর দেহের গঠন সবটাই পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করে। সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়ান ঘনাদা। আমরা ধরে নিতে পারি যে বাংলা সাহিত্যে দাদাদের সৃষ্টি ঘনাদা থেকেই? কারণ ঘনাদার অনুসরণে টেনিদা, ব্রজদা, ফেলুদা, ঋজুদার জন্ম। টেনিদা তো বলেছেন ঘনাদার পায়ের ধুলো পেলে বর্তে যান। আসলে টেনিদাকে প্রেমেন্দ্র মিত্র সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান এবং সর্বত্রগ করে হাজির করেছেন। তিনি এমন বিরাট যে সব সমস্যার সমাধান করতে পারেন। তিনি রোমাঞ্চকর অভিযান দারুণ ভালোবাসেন। যতদূর জানা গেছে হিন্দি, গুজরাটী মালায়ালাম এবং ইংরেজীতে অনুবাদ হয়েছে ঘনাদার বহু গল্প। এর থেকে তার জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত মেলে। তাছাড়া আধুনিক রূপকথা বলতে প্রেমেন্দ্র এই কল্পবিজ্ঞানকে বুঝিয়েছেন। কিশোররা তো মনেপ্রাণে গ্রহণ করছে।

বুদ্ধদেব বসু অবশ্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই রোমাঞ্চকর অভিযানের সমালোচনা করে লিখেছিলেন, তাঁর 'এ্যান একর অব গ্রীন গ্যাস' বইতে। তিনি

বলেছিলেন, 'It has often occurred to me that prevalent public taste determines the forms of literary compositions; that a writer, though free to choose his content, must, in order to have any readers at all, put it in a form at least moderately in vogue, I find some instances of this in Bengali literary scene. Our public seems able to relish surface humour only when connected with satire, and tales of adventure only on the level of Jules Verne. Both adventure and innocuous humour have, for some strange reason, been relegated entirely to juvenile literature. This, I can not help feeling, has resulted in two serious injuries; Premendra Mitra, completely equipped writing for adult tales of adventure, or romances, as they used to be called, **had never had the chance of writing one;** and Sivaram Chakravorty, gifted with an irrepressible and often irresistible humour, has after a long struggle, finally submitted himself to the awkward position of a writer for children only'. পৃঃ ৯২

৭২ নং বনমালী নস্কর লেনের আড্ডায় ছিঙের কচুরী আর মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গল খেলার যাদুর মধ্যে ঘনাদা গল্প বানান, নতুন নতুন গল্প। মেসের সবাই সেটা জানে। কিন্তু সেই গল্প নতুন স্বাদের, নতুন কিছুর সন্ধান দেয়। তিনি সমুদ্রের তলায় মাস খানেক কাটাতে পারেন, আবার মরক্কোর পশ্চিমে মদিরা অ্যাবিসাল প্লেন থেকে প্লেটো আর অ্যাটাবাণ্টিস সি মাউণ্ট হয়ে সার্গাসো সমুদ্রের উত্তর সোহম্ অ্যাবিসাল প্লেন পেরিয়ে বামুর্ডা বেডেণ্টাল পর্যন্ত আটলাণ্টিকের বিশাল অতল রাজ্যের নানান তথ্য নিয়ে এক নির্জন তীরে উঠতে পারেন। অথবা 'পুমোরি' চূড়া বাঁয়ে রেখে 'লো-লা' চূড়ার দিকে উঠতে উঠতে হঠাৎ 'লো-লা'ও বাঁয়ে ফেলে ডানদিকে নুপৎসে ও লোৎসের চূড়া, সামনে একটু বাঁদিক ঘেঁষে মাউণ্ট এভারেষ্ট পাশ দিয়ে তুষার প্রান্তরে গিয়েছেন হ'য়েতির টানে। অথবা দক্ষিণ মেরুতে মাউণ্ট হ'রেবাস ও অন্য একটি আগ্নেয়গিরির সন্ধান যেমন ঘনাদা জানতে পেরেছেন, তেমনি আশ্চর্যজনক এক আগ্নেয়গিরির মুখে পড়ে কোমরে বাঁধা ভাবুটায় গ্যাস ভরে যেতে পারেন এক পাহাড়ে—বিরাট ice berg বা বরফের পাহাড়। সেই বরফের পাহাড় গলতে গলতে দুজনের দাঁড়াবার

মত ছোট হয়ে গেলে ভাসতে ভাসতে ম্যাক-ওয়ারী দ্বীপ পর্যন্ত আসতে পারেন। এঁরই নাম ঘনাদা।

'সূর্য কাঁদলে সোনা'তে ভারতবর্ষের পূর্ব উপকূল থেকে সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বতীরের উত্তুঙ্গ আণ্ডিজ পর্বতমালার দেশ পেরু সাম্রাজ্য পর্যন্ত ঘনাদার যাতায়াত। সময় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক। ইতিহাসের বহু বিচিত্র নামে ভরা উপন্যাসে ঘনাদা এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় পিজেরোর পেরু অভিযানকে কেন্দ্র করে ঘনশ্যাম দাশের আদি পুরুষ গানাদোর ইতিহাস ভূগোল পরিক্রমা। আদি পুরুষ ঘনরামও কম ছিলেন না। ছেলেবেলাতেই ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের সমুদ্রে পর্তুগীজ বোম্বেটেদের লুট করা, জ্বালিয়ে দেওয়া তাম্রলিপ্তির সওদাগরী জাহাজ থেকে রক্ষা পেয়েও ধরা পড়ে প্রায় অর্ধেক যৌবন পর্যন্ত পোর্টুগাল স্পেনে এবং পরে এখন যা আমরা কিউবা মেক্সিকো বলেই জানি, সেই দুই দেশে ক্রীতদাস হয়ে কাটিয়ে ওই 'মাস্টা' আবিষ্কারের পুরস্কার স্বরূপ দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলেও নিজের বংশের ধারায় ওই চরম গ্লানি ও পরম গৌরবের অধ্যায় চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্যে দাস পদবীই গ্রহণ করেছিলেন। গানাদোকে যখন আনা ভালবেসেছে, তখন তার স্বামী সোরাবিয়া প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছে। আবার সুদূর পেরু থেকে সূর্য কন্যা 'মুইস্ক্যা বংশের মেয়ে 'কয়া' তার সঙ্গে এলে পানামার সোরাবিয়া কয়াকে লুটে নেবার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। ইংকা অধীশ্বরদের সম্পদ, সূর্যদেবের জমানো চোখের জল রাখতে বা বার করে আনতে এত আয়োজন।

ঘনাদার এই বুদ্ধিদীপ্ত আয়োজন শিশু বা কিশোরদের জন্যে নয় এমন কথা বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন। এগুলি বয়স্কদের জন্যেই। তাঁর 'Scientific romances, remarkable for plotcruft which could have compared with those of wells if Premandra had intended them for adults instead of juveniles'; তবুও তো দেখা যাচ্ছে যে দীর্ঘদিন ধরে কিশোররাই এই সব গল্পের পাঠক, শিশুরা নয়। কারণ বৈজ্ঞানিক এই সব তত্ত্ব বা তথ্য বা গল্পের মার প্যাঁচ, শিশুদের বোধগম্য নয়। তবে বয়স্করাও এর পাঠক সন্দেহ নেই। তুলনায় শিবরাম চক্রবর্তীর হর্ষবর্ধন গোবর্ধন শিরোনামের গল্পগুলিতে কথার মার প্যাঁচ কথার পিঠে কথা চাপিয়ে হিউমার গড়ে তুলে শিশুদের উপভোগ্য রচনা উপহার দিয়েছেন। সিট+আরাম=সীতারাম, এমন শব্দবিন্যাস শিবরামের দান। বাংলার পাঠক সমাজ তো তাও হাসিমুখে গ্রহণ করেছেন, ভিন্নস্বাদের রচনা বলেই।

যাইহোক ঘনাদার গল্পগুলির একটা সামাজিক মূল্য (Social value) আছে। প্রতিটি গল্পের মধ্যে যে গঠন পদ্ধতি আছে তাতে কোথাও হয়ত কিছু খুঁটিনাটি বা পরিবেশ সৃজনে অতিরিক্ততা থাকলেও মূল উদ্দেশ্য কিন্তু একটা আছে—গল্পের মোড়কটি খুলে সেই আসল জায়গায় পৌঁছুতে পারলে গল্পের আনন্দ পাওয়া যাবে। যেমন 'মশা' গল্প : মশার মুখ একটা ডাক্তারি যন্ত্রের বাক্সের মত। গায়ের ওপর বসে প্রথম একটি যন্ত্রে সে চামড়া ফুটো করে, তারপর আর একটি যন্ত্রে মুখের লালা সেখানে লাগিয়ে দিয়ে আমাদের রক্ত যাতে চাপ না বেঁধে যায় তার ব্যবস্থা করে। এরপর তৃতীয় নল দিয়ে সে রক্ত শুষে নেয়। আমাদের শরীরে যে রোগের জীবাণু ঢোকে, সে তার ওই দ্বিতীয় যন্ত্রের লালা থেকে। মশার জন্মের পর যদি কোন উপায়ে তার লালার এমন রাসায়নিক পরিবর্তন করে দেওয়া যায় যে, বিষাক্ত ম্যালেরিয়ার জীবাণু তার ভেতর বাঁচতেই পারবে না, তাহলে মশা হাজার কামড়ালেও আর আমাদের ভয় নেই। জাপানী কীটতত্ত্ববিদ মি. নিশিমারার মুখে এই কথা বসিয়েছেন গল্পকার। সারা গল্প সেই প্রেক্ষিতে। তাই শুরু গবেষণা এবং শেষ পর্যায়ে তার গবেষণা যে রহস্যময় সেকথা প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীর শত্রু মানুষ মশার লালায় পরিবর্তন ঘটিয়ে সাপের চেয়েও মারাত্মক বিষাক্ত করে তুলেছে। বিজ্ঞানীর এ হেন কাজকর্ম সত্যি অনুধাবনীয়।

অনেক গল্পের মধ্যে 'ধুলো'। ধুলো সিলভার আইওয়াইড। ঝড় বেগে ধাবিত হলে এই সিলভার আইওয়াইড উড়িয়ে দিলে তা প্রশমিত হয়ে যায়। হলদে রঙের এক রকম ধুলোর মতো গুঁড়ো। ঘনাদা ব্যাখ্যা করলেন 'এ. জি. আই.' সে তো শুধু বৃষ্টি নামাবার জন্যে সাধারণ মেঘের ওপর ছড়ানো হয়। কিন্তু ফ্লোরা ডোরার মত প্রলয়ঙ্করী হ্যারিক্যান থামানো যায়। এই সব গল্পের একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। প্রতিটি গল্পের এই জন্যে সামাজিক মূল্য কম নয়। 'পোকা' গল্পে ঘনাদা সমস্ত আফ্রিকা ঘুরে বার-এল-আরব নদীর ধারে পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা মানুষ ডিঙ্কাদের দেশে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর পকেটে কৌটোয় মরা পোকা যা সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়া - এই পঙ্গপালে আকাশ ছেয়ে গেলেও ঘনাদার হাতে সেই পোকার যম ছিল—একটি পতঙ্গের মধ্যে তা ঢুকিয়ে দিতেই তা সংক্রামিত হয়ে পোকাগুলোর মৃত্যু ঘটালো।

অনেক সামাজিক সমস্যার সমাধানের জন্যে ঘনাদার চেষ্টার অন্ত নেই সাধারণ মানুষের জন্যে তাকে ভোটে নামতেই হচ্ছে : (১) দেশের নাড়ী বড় ক্ষীণ / ঘনাদাকে ভোট দিন। (২) সফেদ হবে লাল চীন / ঘনাদাকে

ভোট দিন। (৩) ভোট দেবেন কাকে? বিশ্ব-ঘনাদাকে? কী করবেন তিনি? কালোবাজার সাদা করে / সস্তা চাল তেল চিনি। এরকম ছড়াও দেখি 'ঘনাদাকে ভোটদিন' গল্পে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র যখন সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কার পান তখন 'অনুষ্টুপ' [নবম বর্ষ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা] পত্রিকায় যে সমালোচনার ঢেউ উঠেছিল তার শিরোনাম ছিল। 'প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ রুশ ভল্লুক ও ঘনাদা।' পত্রিকা পেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্যকর্মের জন্যে এই পুরস্কার প্রাপ্তিটাকে সহজ মনে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর আক্রমণ নানা খাতের মধ্যে ঘনাদার দিকেও ছিল ঃ তাঁদের ঘনাদা প্রসঙ্গে বক্তব্য ঃ '...তাঁর আর এক সৃষ্টি, ঘনাদা ওরফে ঘনশ্যাম দাস। এই অতিমানব ঘনাদার অদ্ভুত, আজগুবি, হাস্যকর যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে ছোটদের অনাবাদী মাথায় খুব সচেতনভাবে এক বিষাক্ত বিষ ক্রমান্বয়ে ঢুকিয়ে যাচ্ছে, যার কাছে মার্কিন কমিকস্‌রাও হার মানে।' পাঠক সাধারণের কাছে নিশ্চয়ই নতুন করে বলার কিছুই নেই যে এঁরা রবীন্দ্রনাথকেও একজন প্রতিক্রিয়াশীল ভারতীয় লেখক হিসেবে ঐ একই প্রসঙ্গে চিহ্নিত করেছেন। যে ঘনাদাকে নিয়ে সকলের একটা কৌতুহল তার প্রসঙ্গে আমরা আরো কত নতুন সমালোচনা আমাদের দেশেই আশা করতে পারি। বিচিত্র কি?

অথচ এই আমাদের দেশে ঘনাদা 'ক্লাব' তৈরী হয়েছিল ১৯৮৩ সালে ঘনাদা চর্চার জন্যে। আমেরিকায় শার্লক হোমস ক্লাব তৈরী হয়েছে, তেমনি কলকাতায় 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার' পক্ষ থেকে ঘনাদা ক্লাব তৈরী হলো কল্পনার ক্ষমতা কিশোর কিশোরীর বৃদ্ধি করে ঘনাদার অনুকরণে বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলি প্রচার। কারণ ঘনাদা তো শুধুমাত্র মর্তে বিরাজ করেন না তিনি মঙ্গলেও পাড়ি দেন। ঘনাদা মঙ্গলের দক্ষিণ গোলার্ধের একটি জায়গা যা ইলেকট্রিক নামে পরিচিত সেখানেই নেমেছিলেন। সেখানকার মেরুর আইসক্যাপ অর্থাৎ হিমমুকুট জল নয়, জমানো কার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়ে তৈরী বলে অনেক জ্যোতিষী বৈজ্ঞানিকের ধারণা। কিন্তু ঘনাদা তা ভুল প্রমাণ করেছেন। পৃথিবীর মেরু প্রদেশের মতো মঙ্গলেরও গ্লেসিয়ার অর্থাৎ হিমবাহ আছে বলে জানা গেছে। কার্বন ডাইঅক্সাইডের শুকনো তুষার থেকে কিন্তু হিমবাহ সৃষ্টি হয় না। হিমবাহের অস্তিত্ব থেকেই সেখানে জল আছে বলে ধরে নেওয়া যায়। আর জল থাকলে সেখানেই অন্তত প্রাণের চিহ্ন পাবার আশা কিছুটা করা যেতে পারে। অ্যান্টি ম্যাটারের জোরে নির্মিত শূন্য মনে ঘনাদার ভ্রমণ কাহিনী নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিকদেরও মঙ্গলগ্রহ অভিযানে উদ্বোধিত করবে হাউই বারুদই।

মহাকাশ বিজয় সম্ভব করে তুলবে এই নির্ভুল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে তাঁর 'পৃথিবী ছাড়িয়ে' [শুক্রেয়ারা গিয়েছিল'] গ্রন্থে রচিত হয়েছিল। ঘনাদা অবশ্য কখনো কখনো গুরুদেবের মতো জ্ঞানও দেন। বলেন ছড়ায় ঃ

ঘনার বচন শোনো,
সোজা হিসাব ক'জন বোঝে
উল্টো করে গোনো।

বা যে দিকেই ভোর হোক্‌ সেইটাই পূর্বদিক / এইটুকু জেনো নির্ভুল! তাই বলি, পৃথিবীটা / যে দিকেই পাক খাক্‌ / নিজের মাথাটা রাখো ঠাণ্ডা। / পাত্তা না পায় যেন / হাহাকার মন্তর / পড়াবার ঘুঘু / সব পাণ্ডা। [ঘনার বচন—এক, দুই।]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা সৃষ্টির মধ্যে যে বিশাল একটি পরিপ্রেক্ষিত আছে যাতে বিজ্ঞান, রোমাঞ্চ অভিযাত্রা থেকে শুধু কৌতুহলোদ্দীপক সব তথ্য ও তত্ত্ব, সংশয় ও তার নিরসন সবই মূর্ত হয়ে উঠেছে। ঘনাদার সভাটি পঞ্চরত্ন সভা যেখানে সাম্রাজ্যবাদ ও বাজার দর থেকে শুরু করে বেদান্তদর্শনও আলোচিত হয়ে থাকে।

মনে হয় একই ঘনদাকে বারে বারে পাঠকের সামনে না এনে 'মামাবাবু' নামে আর এক বৈজ্ঞানিক গোয়েন্দা সৃষ্টি করলেন। মামাবাবু 'কুহকের দেশে' (১৯৬৩) গিয়েছিলেন বহুকাল আগে। আমেরিকার এক ঘড়ির কারখানার শ্রমিকের দেহের ভিতর রেডিয়ামের ক্রিয়া দেখা গেছে খবরের কাগজের এই খবরের ওপর ভিত্তি করে মামাবাবুর রোমাঞ্চকর অভিযান কুহকের দেশে। 'ড্রাগনের নিঃশ্বাসে'ও (১৯৬৫) যে দেশ ছারখার হতে বসেছিল সে দেশে গিয়েও তিনিও ভয়ঙ্কর রহস্য উদ্ঘাটিত করেছিলেন। তারপর দীর্ঘদিন তার মামাবাবুর কোন খবর পাওয়া যায়নি। এরপর হঠাৎ মামাবাবু ফিরেছেন (১৯৬৮)। এই মামাবাবু ফিরেছেন রোমাঞ্চ উপন্যাসে প্রেমেন্দ্র মিত্র দেখিয়েছেন ভারতবর্ষে লেবুর বাগানে অপ্রত্যাশিত অ্যাকিড জাতীয় এক পোকার আক্রমণ। মিঃ ভোরা এই পোকা ছেড়ে দর কমিয়ে সব ফলের বাগান কেনার চেষ্টা করলে মামাবাবু তা ধরে ফেলেন। এপিল্যাকনা বোরিয়ালিস নামে শত্রু পোকা ধ্বংসের জন্যে গোলা এনে তা সতর্কতার সঙ্গে ছেড়ে পরে পুলিশে ধরিয়ে দেন। 'ড্রাগনের নিঃশ্বাস' গ্রন্থে মামাবাবু অসৎ লোভী বিজ্ঞানী 'ড্রাগন' সাজিয়ে যাকে দিয়ে সমস্ত উপত্যকার লোককে আতঙ্কে দেশ ছাড়া করেছেন, সেই যুদ্ধের ট্যাঙ্কটি, পথঘাট না থাকলেও অনায়াসে যে কোন বন্ধুর মাঠের ওপর দিয়ে ঘণ্টায় বিশ মাইল

যেতে পারে। কলকাতা থেকে মামাবাবু সবার আগে জাহাজে ব্যাংকক পৌঁচেছেন, এবং তার মধ্যেই ড্রাগনের সন্ধান করে ফেলেছেন। অবশ্য দুঃসাহস একটু বেশী দেখাতে গিয়ে আগুনের হলকায় প্রাণটা তার যেতে বসেছিল। তুচ্ছ মনে হলেও যাযাবর হাঁসের রহস্যটা যে সমস্ত অভিযানের মূল, একথাও পরিষ্কার হয়ে গেল। গোপন দুর্গ তৈরীর দরুণ মানুষও মোটর লরি প্রভৃতির আনাগোনায় হাঁসেরা এ উপত্যকা পরিত্যাগ না করলে মিস্টার মরগ্যান তাঁর শিকারের প্রবন্ধে কোনো প্রশ্ন তুলতেন না, এবং লুয়ং উপত্যকা এখনও সবার অজ্ঞাতে গোপন শত্রুর চক্রান্তে অভিশপ্ত হয়ে থাকতো। ঐ অঞ্চলে পাহাড়ে আগুন লাগিয়ে খনির সন্ধানে ব্যাপৃত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আর বেশী দিন চলল না মামাবাবুর অভিযানে। মামাবাবুর এই বিজ্ঞানী মানসিকতার শেষ প্রমাণ তাঁর 'খুনে-পাহাড়' গ্রন্থে। আদিবাসীদের মধ্যে কে বা কারা প্রচার করেছে যে পবিত্র লোধমা পাহাড়ে ওঠা নিষেধ। বুনো হাতির অত্যাচার, একজন আদিবাসীর খুনকে কেন্দ্র করে এই সব প্রচার। আসলে ঐ অঞ্চলে বহু মূল্যবান রত্নের সন্ধান পেয়েছেন যাঁরা তারা কিন্তু মামাবাবুর জন্যেই হটে যেতে বাধ্য হলেন। রত্নটি হোল পেরিডাইট এতে শুধু ক্রোমিয়াম প্লাটিনাম নয়, ম্যাগ্নেটাইট অলিভিন ইত্যাদিও মেলে। তাই মনে হয় ঘনাদা যেমন সব বিষয়ে অভিজ্ঞ, প্রেমেন্দ্র সেভাবে না করে শুধুমাত্র বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা নিয়েই মামাবাবুকে গড়েছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র মৃত্যুর কিছু আগে ১৯৮৭ নভেম্বর কলেজ স্ট্রীট পত্রিকায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে এক সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন, তাঁকে বলেছিলেন 'আমার ছোটদের প্রথম গল্প 'পিঁপড়ে পুরাণ', তারপর সায়েন্স ফিকসান লিখতে শুরু করি। ভাবলাম একটা চালিয়াৎ চরিত্র তৈরী করি। যাকে নিয়ে নিয়মিত লেখা যাবে। ঘনাদা তখন মাথায় এল।' ঘনাদাকে 'চালিয়াৎ চরিত্র' বলায় এমন একজন বিশিষ্ট চরিত্রের কথা বলা হচ্ছে যাতে বোঝা যায় এই চরিত্র নানা গুণের সমন্বয়। পারেন না এমন কোন কাজ নেই তিনি বৈজ্ঞানিক, গোয়েন্দা, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং দার্শনিক। তবুও প্রেমেন্দ্র তাঁর একজন দোসর হিসেবে মামাবাবু সৃষ্টি করেন যাঁর কাজ শুধুমাত্র বিজ্ঞান সন্ধিৎসা। কিন্তু তারও বহু পূর্বে অপেশাদার গোয়েন্দাগিরির জন্যে পরাশর বর্মাকে সৃষ্টি করেছিলেন। যার পরিচয় ডিটেকটিভ ১৯৩২ সালে 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় পরাশরের প্রথম আবির্ভাব। বলতে পারি পরাশর বর্মা লিখতে গিয়ে তাঁর মানসপটে নানা প্রশ্ন ও তাদের সমাধান চিন্তিত হয়েছে এবং সেই জন্যে তাঁর নিজেরও বিজ্ঞান-সন্ধানী মন ঘনাদা ও পরে মামাবাবু রচনা করেছে। অথচ ঘনাদা অনুজ হয়েও বড় সর্বদিক থেকে।

তাহলেও পরাশর বর্মা নানা অসম্ভব রহস্যের সমাধান করেছেন বলেই ঘনাদার সঙ্গে তার সম্পর্কও মধুর। পরাশর কবি। গোয়েন্দা কবি। অপেশাদার গোয়েন্দা : পরাশর বর্মা কি করে গোয়েন্দা হলেন তার কাহিনী। পরাশর বর্মা বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। তাঁর গোয়েন্দা হওয়ার কাহিনী 'গোয়েন্দা হলেন পরাশর বর্মা'তে লিপিবদ্ধ আছে। পরাশরের পিসিমার বান্ধবীর মেয়ে বিনি (বিনতা) আর পিসিমার মেয়ে শর্মিলা একসঙ্গেই পড়তো। বয়স কুড়ি-একুশ। শর্মিলা আধুনিকা, অনেককেই টেক্কা দেয়। সে রাজনৈতিক দলে নাম লিখিয়েছিল, তাও ছেড়েছে এখন। আর্ট কলেজে ঢোকার আগে কাশীতে তার মার সঙ্গে দেখা করতে যায়। বিনির শর্মিলার ওপর অন্ধ ভক্তি ছিল স্কুলজীবন থেকেই। কলকাতা থেকে সওয়া একশ মাইল দূরে একটা ধ্বংসস্তূপের দেশে গ্রামলক্ষ্মী সমবায়ে শর্মিলা বিনিকে যুক্ত করেছে। পরাশরের ওপর দায়িত্ব পরীক্ষার দেবার অবসরে বিনিকে পিসিমার কাছে ফিরিয়ে দেবার কাজ নিয়েই পরাশরের গোয়েন্দা সাজা।

প্রেমেন্দ্র মিত্র 'বাংলায় ডিটেকটিভ গল্প' প্রবন্ধে লিখেছিলেন,··আমাদের মনের সবচেয়ে প্রবল যে বৃত্তি, অজানা সম্বন্ধে সেই কৌতূহলই গোয়েন্দা কাহিনীর মূলধন। তথাকথিত সৎ সাহিত্যের তুলনায় গোয়েন্দা কাহিনীর আর একটি মস্ত গুণের কথাও বলা উচিত। তা হল তার সাধুতা আর সরলতা। জটিল কুটিল শঠ কপট নিয়েই তার কারবার, কিন্তু পাঠকের সঙ্গে সত্যিকার কোন অসাধুতা সে করে না। সাহিত্যের নামে অনেক গল্প উপন্যাস নাটক সৎ অসৎ শোভন অশোভন কতরকম সওদাই ফিরি করে; কিন্তু গোয়েন্দা কাহিনীর বেসাতি একেবারে নির্ভেজাল রহস্য নিয়েই শুরু। ঘোর প'্যাচ যা থাকবার তা কাহিনী বিন্যাসেই থাকে, উদ্দেশ্যে নয়। কোন ছদ্মবেশী সাহিত্যের মত নিরীহ অসন্দিগ্ধ পাঠককে গল্পের প্রলোভনে উদ্ভট নীতির সমস্যাসঙ্কুল দুর্গমতায় সে টেনে আনে না।·· রহস্য রোমাঞ্চের কাহিনী আছে বলেই এ যুগের অধিকাংশ মানুষ নির্বিকারভাবে দুবেলা ছক-বাঁধা ঘরে সাজানো ঘুঁটির মত নড়ে একথা নিছক অতিশয়োক্তি বোধহয় নয়। রহস্য রোমাঞ্চের ডিটেকটিভ গল্পের স্বপক্ষে যেমন বিপক্ষেও তেমনি বলার কিছু নেই এমন নয়। যা নিয়ে তার কারবার সেই রহস্য বস্তুটিরই গূঢ় মর্ম তার যেন অজানা। পৃথিবীটা যে অসীম রহস্যময় একথা বোঝা অতি সোজা বলেই নিতান্ত ভুলপথই সে বেছে নিয়েছে। তার আর একটা মহৎ দোষ এই যে, দৃষ্টিশক্তি তার বড় ক্ষীণ। কাছের অত্যন্ত মোটা জিনিষ ছাড়া আর কিছু তার নজরে পড়ে না; তার রঙ কানা চোখে কালো ছাড়া কোন

বর্ণ যেন দুনিয়ায় নেই। খুনোখুনি না হওয়া সত্ত্বেও আমাদের পাশের বাড়ী যে রূপকথার মায়াপুরীর চেয়ে রহস্যময় হতে পারে এ খবর সে জানে না। গোয়েন্দার চেয়েও অদ্ভুত অসংখ্য মানুষ যে প্রতিদিন রাস্তাঘাটে ভিড় করে থাকে সেকথা সে ভুলে গেছে। হত্যাকারীর চেয়ে দারুণ রহস্য যে আমরা প্রত্যেকে প্রতিমুহূর্তে নিঃশব্দে নিজেদের বুকে গোপন করে চলেছি এ সত্য তার অজানা। উত্তেজনার জন্যে আদালত থানা লাসঘর থেকে কতদূরে দুর্গমেই না সে গল্প ছুটে মরে, তবু সাহস করে অপরূপ পৃথিবীর সেই একটি বিস্ময়কর প্রান্তে কখনও পা বাড়ায় না যেখানে নিজেরা আমরা থাকি।' প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই নিজস্ব মন্তব্যের দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে এটাই প্রমাণিত যে কবি-গল্পকার যেভাবে জীবনকে উপলব্ধি করেছেন, ঠিক সেইভাবেই গোয়েন্দাগল্পকে সাজিয়েছেন; তাঁর এই উদ্ধৃতি আমাদের জানিয়ে দেয় যে গোয়েন্দাগল্প আমাদের জীবনের অনেক রহস্য উদ্ঘাটন করে, আবার অনেক পাশাপাশি রহস্য আবৃত থেকে যায়। তবুও প্রেম থেকে শুরু করে নানা সমস্যার কুয়াশা ভেদ করে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে তাঁর গোয়েন্দা-কাহিনীর বিন্যাস। সেজন্য তিনি পরাশর বর্মার সহকারী হিসেবে কৃত্তিবাস ভদ্রকে রেখেছেন। পরাশর গোয়েন্দা কবি। গোয়েন্দাগিরির ফাঁকে ফাঁকে কবিতা লেখেন।

তাঁর স্মৃতিচারণায় ['নানারঙে বোনা'] তিনি জানিয়েছেন যে, টেনিদা ওরফে বিমলচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে ঢাকা যাওয়ার পথে আঠাশ নম্বর গোবিন্দ ঘোষাল লেনের মেসবাড়ীতে ছিলেন। এই বহুদিনের অব্যবহৃত বাস্তিটির খোলা ছাদের কলের জলের হিস্ হিস্ শব্দ যুবক প্রেমেন্দ্রকে রীতিমত ভীত করেছিল। তারপর তিনি রাত জেগে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে কলতলায় হাত ধোয়ার পর অলক্ষ্যে হাতের জল লণ্ঠনের মাথায় পড়ায় হিস হিস শব্দ ওঠে। এই সাসপেন্সই তাঁর গোয়েন্দাগল্পের উৎস।

তবে তাঁর পরাশর বর্মা নানা কাজ করেছে। আন্তর্জাতিক চোর মিঃ যশোবন্ত নাগেশ্বরের চালবাজি ধরেছেন 'গন্ধ পেলেন পরাশর বর্মা'য় আবার চোরা-কারবারে ক্লু ধরে বার করেছেন ['ক্লাবের নাম কুমতি']। আবার বিভিন্ন খুনের দায়ে আসামী মিঃ রাহাকে পরাশর সনাক্ত করেছেন ['নৌকায় পরাশর বর্মা']।

পরাশর বর্মা, ঘনাদা ও মামাবাবু তিনজনই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, সূক্ষ্ম অনুভূতির সমন্বয়। প্রত্যেকের মধ্যে যে জটিলতার ভেতর থেকে এক আলোকরশ্মি আবিষ্কার করাই এঁদের তিনজনের ধর্ম। তবে মামাবাবু শুধুই বিজ্ঞান-দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। তাঁর সঙ্গী মণ্টুপো, তাঁকে

সকল সময় সহায়তা করে থাকেন। শেষ গ্রন্থ 'ঘনাদা ও দুই দোসর মামাবাবু ও পরাশর'-এ মামাবাবু বৈজ্ঞানিক গোয়েন্দার ['পরচুলা সাহেব ও মামাবাবু'] ভূমিকা পালন করেছেন। মামাবাবুর আন্তর্জাতিক আদালতে যে মামলা চলছিল সেই মামলার নিষ্পত্তি হলো। পরচুলা সাহেব পেরন যে পরচুলা পরেন তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মামাবাবু জেনেছেন যে চতুর্দশ শতাব্দীর পরচুলা বা উইগ তিনি মাথায় পরেছেন, আর আসল পরচুলাটা গুছিয়ে রেখেছেন। কিন্তু লুকানো পরচুলায় আছে উকুনের ঝাঁক যা মহামারী ছড়ায়। টাইফাস এর জীবাণু ভরা কাচের পাত্র একেবারে ধ্বংস করে মামাবাবু দেশকে মহামারীর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

'পরাশরে ঘনাদার' গল্পে পরাশরের সঙ্গে ঘনাদার একবার সাক্ষাৎ ঘটে। কিন্তু আশ্চর্য পরাশর না এসে কৃত্তিবাস ভদ্রই এসেছিলেন ঘনাদার মেসে। ঘনাদা বলেছেন, পায়ের ধুলো যখন দিয়েছেন তখন ওঁকে বসতে বলো। অথচ সত্যি সত্যি কৃত্তিবাস ভদ্র এসে ঘনাদার পায়ের ধুলো নিয়েছেন আশ্চর্য এই মিলন প্রসঙ্গ ওলিস কুগার। হিটলারের জার্মানীতে একটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প চালাত। তারপর যুদ্ধে জার্মানীর হার হবার পর লুকিয়ে বারবার নাম ভাঁড়িয়ে অনেক ছলচাতুরী করে আফ্রিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া, সেখান থেকে কানাডা হয়ে আমেরিকার দক্ষিণে পালিয়ে আসে। সে যে সেখানে এসেও কি সর্বনাশ শয়তানী চক্রান্ত আঁটছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যারা জার্মানীর বিপক্ষে ছিল সেই সমস্ত দেশের মানুষের মধ্যে কে যে প্রথম ধরে ফেলে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন তা আমেরিকার আরিজোনা থেকে মিঃ ফেগানের জরুরী ডাক পেয়ে সেই ফেগানের বিরাট র‍্যাঞ্চে যাবার পর পরাশর বুঝতে পেরেছেন। র‍্যাঞ্চের চাষ লোক-দেখানো ভুট্টার হলেও আসলে তা আগাছার। আর এমন আগাছার যা মানুষের এতকালের চাষ কৃষিবিদ্যাকে ধ্বংস করার সর্বনাশ আয়োজন করতে পারে। তাই এই সভ্যতা ধ্বংসকারীর আসল নাম ফেগান নয় কুগার। কুগার ধরা পড়ে গেল পরাশরের হাতে। পরাশরের এ হেন বক্তব্যে ঘনাদার তৃপ্তি যেন উপছিয়ে পড়ছিল। তাই পরাশরের বিদায় নেবার পর ঘনাদা মন্তব্য করেছেন, 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্। পেটে সত্যিকার বিদ্যে আছে তাই ওর বিনয়।'

সবশেষে আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি ঘনাদা ভ্রাম্যমান হোন বা চালিয়াৎ বা কৌশলী হোন তাঁর মধ্যে বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা যেমন ছিল, তেমনি গল্পকথন দক্ষতা ছিল, ছিল ইতিহাস ভুগোলের পূর্ণতর জ্ঞান তারই দোসর [দোসরা—সঙ্গী] হিসেবে শুধুমাত্র বিজ্ঞানসন্ধানী মামাবাবু এবং অপেশাদার গোয়েন্দা পরাশর কাজ করেছে। তিনজনের কাজের লক্ষ্য কিন্তু

এক এবং অভিন্ন। প্রত্যেকেই সমস্যার সমাধান করে আনন্দ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। কিন্তু কবি প্রেমেন্দ্র যে জাগতিক বিস্ময় দেখেছেন সেই বিস্ময় বা রহস্য ভেদ করতে কি এঁরা চাননি? অসীম রহস্যভরা এই পৃথিবীর রহস্য আবিষ্কারের জন্যে এই তিন কৌশলী তাঁদের অভিজ্ঞতা দিয়ে চেষ্টা করেছেন, তাই এঁদের কর্মতৎপরতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কবির কবিতাই মূর্ত হয়ে ওঠে :

চকিতে দেখিয়ে আধখানা মুখ রহস্যে ফের ঢাকবে।
শুধু বিদ্যুৎ কটাক্ষে কোথা ডাকবে।
না গিয়ে শান্তি পাবে না।
যতই এগিয়ে যাও না সামনে
সংশয় তবু যাবে না।

যদি দিশাহারা পান্থ, / হয়ে থাকো উদ্‌ভ্রান্ত, / এ মধুর বিভ্রমটুকু / দিয়েই বানানো প্রাণ তো।

['পর্দা' / 'হরিণ-চিতা-চিল']

রবীন্দ্রনাথ ও প্রেমেন্দ্র-সাহিত্য

কল্লোলগোষ্ঠীর কবিদের কারো কারোর মধ্যে আপাত রবীন্দ্র বিরোধিতায় জলোচ্ছ্বাস দেখা গেলেও, 'সম্মুখে থাকুন বসি পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর' প্রভৃতি তাঁদের কারোর কারোর কবিতায় ব্যক্ত হলেও তাঁরা কিন্তু কেউ রবীন্দ্র-বিরোধী নন। রবীন্দ্র বৃত্তে তাদের যথাযোগ্য অবস্থান হয়েও তাঁরা স্বকীয় দ্যুতিতে প্রোজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক সুষমা অনেক কবির ওপর এক মায়াময় প্রভাব বিস্তার করেছিল, সৃষ্টি হয়েছিল এক রবীন্দ্রানুসারী কবিগোষ্ঠী। রবীন্দ্রনাথের 'কলাকৈবল্যবাদ, অনুপ্রেরণা কর্ম', শুদ্ধসৌন্দর্য সূত্র অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদ ও অধ্যাত্ম বিবেক প্রবণতা, সমর্থন করতে পারেননি কেউ কেউ, তাই রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসে তৈরী করেছিলেন এক বিশেষ জগৎ। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই গোষ্ঠীর অন্যতম। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর যুগে যে সব কবি বিষয় বৈচিত্র্যে ও যুগোপযোগী বাস্তবতায় কবিতায় ঘর ভরিয়ে তোলেন - রাবীন্দ্রিক সার্বভৌম আদর্শ থেকে দূরপথ পরিক্রমা করেও রবীন্দ্রনাথকে সশ্রদ্ধ সম্মান জানিয়েছেন — যে কবি পালাবদলের কবিদের অন্যতম — সেই কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। তিনি রবীন্দ্রোত্তর প্রথম আধুনিক কবি। সর্বব্যাপী দুঃখ হতাশা, দারিদ্র্য ও ব্যথা-বেদনার চিত্রসুষমা তাঁর কাব্যে যেমন প্রতিভাত হয়ে গণতান্ত্রিক কবি বলে চিহ্নিত হলেন — তেমনি রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করলেন খুব সহজেই — গ্রহণ করলেন এক সর্বব্যাপী প্রতিভার অধিকারী হিসেবে। প্রেমেন্দ্রের প্রথম কবিতায় ভাবাদর্শে দ্বিজেন্দ্রলালের 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ" কবিতার ছন্দ ছিল — তবুও রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনে, তাঁর প্রেরণায়, তাঁর জীবনের প্রতি কর্মে। তাইতো তাঁর কবিতায় সেই সুরই ধ্বনিত'।

বলেছিলে 'নাইবা মনে রাখলে
সেকথা যে মিথ্যে তা'ত জানতে।
মনে কেন মর্মে আছ,

গহন গভীর উৎস হতে
ছড়িয়ে আছ শেষ চেতনা-প্রান্তে
(পঁচিশে বৈশাখ / কখনো মেঘ)

কবি রবীন্দ্রনাথের সংগে তাঁর প্রথম পরিচয় পর্বটি যে কত মধুর সে কথা কবি তাঁর আত্মজীবনীতে নিটোলভাবে প্রকাশিত করেছে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে ১৯২০ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজে সাময়িক ভাবে প্রজ্ঞান বিভাগে পড়াশুনা করে এই বোহেমীয় কবি শ্রীনিকেতনে গেলেন কৃষিবিদ্যা শেখার জন্যে। কৃষিবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধানকর্তা মিঃ এলথ্ হাণ্ট-এর আনুকুল্য লাভ করে ডাঃ কাসাহায়ের কাছে ফুলের গাছের কাজে তালিম নিচ্ছিলেন। ঐ সময় পৌষমেলায় শান্তিনিকেতনে ঐ কৃষিবিভাগের ছাত্ররা একটি সবজির স্টল খুলেছিলেন, সেইখানেই রবীন্দ্রনাথকে তিনি বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন। এ প্রসঙ্গ তাঁর আত্মকাহিনী থেকে উদ্ধৃত করা যাক্ঃ 'শ্রীনিকেতনের সংক্ষিপ্ত ছাত্রজীবনের কথা রবীন্দ্রনাথকেও বলবার সুযোগ একসময় হয়েছিল অনেক পরে। তখন সাহিত্য রচনার জন্য তাঁর স্নেহধন্য হবার সৌভাগ্য হয়েছে। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতেই প্রথম তাঁর পায়ের ধুলো কবে কোথায় নিয়েছি সে কথা জানাতে সেই প্রথমবারের পৌষমেলার কথা বলেছিলাম। সে মেলা তখন শুরু হয়ে গেছে। রাস্তার ধারেই পর পর আমাদের কয়েকটি স্টল। তাতে আমাদের নিজেদের ফলানো ফুল ফল তরি-তরকারীর সব নমুনা সাজানো। একদিন সকালে রবীন্দ্রনাথ সদলে মেলা ঘুরতে বেরিয়ে স্টলগুলি দেখে গেছলেন। আমাদের অধ্যাপকদের মধ্যে সন্তোষ মজুমদার মশায়ের সেখানে উপস্থিত থাকার কথা মনে আছে। আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন সাহেবকেই চোখে পড়েছিল। পরে জেনেছিলাম তাঁর নাম পিয়ার্সন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্টলে টোমাটো ইত্যাদির মত সবজি দেখে ঠাট্টা করে বলেছিলেন দেখিস্ লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়ে ফেলিস্ না যেন। সেই সময়ে এই স্নেহের ঠাট্টায় ধন্য হয়ে যারা তাঁর পায়ের ধুলো নিয়েছিল তাদের মধ্যে একজনকে দেখে যদি তিনি বেশ একটু অবাক হতেন তাহলে সেটা খুব অস্বাভাবিক হতো না। কারণ আর সকলের মধ্যে ওই ছেলেটির পোষাক লক্ষ্য না করে থাকা খুব শক্ত। গায়ের জামাটা এককালে যে সাদা ছিল তা বোঝবার উপায় নেই, পরণের কাপড়টার অবস্থা ততোধিক শোচনীয়, তার প্রাথমিক রঙ খুঁজে বারকরা রীতিমত গবেষণার বিষয় বললে বেশী বলা হয় না। শান্তিনিকেতনের রাঙামাটির ধুলো জামাটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে রঙীন তো করছেই, কাপড়টিকে করেছে তার চেয়েও বেশী। মাত্র দুটি করে ধুতি আর জামা তো সম্বল।

হপ্তায় একদিন পরিষ্কার করার চেষ্টায় যথাসাধ্য সাবান ঘষেও সেগুলির কালিমা দূর করা যায়নি।

চাষা ছাত্র হিসেবে আমার প্রথম প্রণামের বর্ণনা শুনে রবীন্দ্রনাথ একটু হেসেছিলেন। চাষ শেখা কেন যে তারপর ছেড়ে দিয়েছিলাম তা আর জিজ্ঞাসা করেননি। করলে জবাব দিতে একটু বিব্রত হতে হত নিশ্চয়' (নানা রঙে বোনা : চক্রবর্তী চ্যাটার্জী ১৯৮১, ১১৪-১১৫ পৃঃ)। এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি প্রমাণ দেবে যে প্রেমেন্দ্র মিত্র যৌবনের প্রারম্ভেই রবীন্দ্রনাথের বিশালতায় মুগ্ধ, স্নেহস্পর্শে ধন্য হয়ে পরবর্তীকালে স্নেহভাজন হতে পেরেছিলেন।

…২…

প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম প্রকাশিত কাব্য 'প্রথমা'র একটি বিশেষ কবিতা 'দেবতার জন্ম হোল' (সংহতি আষাঢ়, ১৩৩১)। সেখানে কবি মানুষের ব্যথায়, দুঃখে পঙ্কিলতায় জীর্ণ। কবির জিজ্ঞাসা সত্যিকারের পাপী কে ? : 'কার পাপ নিজেরে শুধাই / মোর ভগবান হ'ন অন্নের কাঙালি, / বিকৃতকুৎসিত আর আত্মার বামন, / রুদ্ধবুদ্ধি বুভুক্ষিত কদাকার প্রাণ ! / কার পাপ ? ** / এ আমার এ তোমার, এ যে সর্ব মানবের পাপ'…অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তার পূর্বেই (২৯শে কার্তিক, ১৩২২) 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ৩৭ সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন : 'ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি। মাথা করো নত। / এ আমার এ তোমার পাপ'। কবি শুধু একথাই বলে ক্ষান্ত হলেন না, বললেন, 'দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানাছলে, / অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে : মৃত্যু করে লুকোচুরি / সমস্ত পৃথিবী জুড়ি'। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কবিতার বিষয়বস্তুর ওপর বাহ্যিক পড়লেও মূল সুর মানুষের স্বার্থপরতার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত এক মানবাত্মার বিরুদ্ধে অভিযানের সুর। কিন্তু প্রেমেন্দ্র বাস্তবভাবে দারিদ্র্যের চিত্র অবলোকন করেছেন, তাই তাঁর কবিতা অনেক বস্তুবাদী। কবি বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মানুষরূপী ভগবানের কান্না শুনতে পান তাই আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন আসে। কবি এই পাপের কারণ বর্ণনা করেছেন : 'দেবতার আলো করি চুরি, / অন্নরাখি কেড়ে / শাস্তি তাই যায় বেড়ে বেড়ে দিনে দিনে' এখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সমান্তরাল হয়েও এগিয়ে এসেছেন একটি তত্ত্বগত সীমায় যেমন, 'বিধাতার বক্ষে এই তাপ / বহুযুগ হতে জমি' বায়ু কোণে আজিকে ঘনায়— / ভীরুর ভীরুতা পুঞ্জ প্রবলের উদ্ধত অন্যায়, / লোভীর নিষ্ঠুর লোভ, / বঞ্চিতের নিত্যচিত্তক্ষোভ, / জাতি অভিমান, / মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান, / বিধাতার বক্ষ আজি বিদারিয়া / ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া' (ঐ ৩৭ নং কবিতা)। শুধু

তাই নয় এই প্রথমার যুগে কবির রোম্যাণ্টিকতা যা নিরুদ্দেশ যাত্রায় চিত্রিত তার সুরও রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতায় ধ্বনিত ; 'ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে / কালোয় ঢেকেছে আলো জানে নাতো কেউ / রাত্রি আছে কি না আছে ; দিগন্তে ফেনায়ে উঠে ঢেউ / তারই মাঝে ফুকারে কাণ্ডারী / 'নূতন সমুদ্র-তীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি'। / বাহিরিয়া এল কা'রা। মা কাঁদিছে পিছে / প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে'। / এই যে সুদূরের আহ্বানে কবির অভিযান, তা তো মাতার কান্না, প্রিয়ার উদ্বেলিত হৃদয়োচ্ছ্বাসে ব্যাহত হতে পারে না। কবি প্রেমেন্দ্র তাই আরো স্পষ্ট করে জানালেন, 'উত্তর মেরু মোরে ডাকে ভাই দক্ষিণ মেরু টানে। / ঝটিকার মেঘ মোরে কটাক্ষ হানে ; / গৃহ বেষ্টনে বসি, / কখন প্রিয়ার কণ্ঠ বেড়িয়া হেরি পূর্ণিমা শশী !' প্রথমার যুগে শুধু বিষয় বৈচিত্র্যে সামান্য দু-একটি ক্ষেত্রে মানসিকতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রেমেন্দ্রের মিল পাওয়া গেলেও আসলে প্রেমেন্দ্র পৃথিবীর এই যন্ত্র-সভ্যতা-লালিত নাগরিক জীবনের কদর্যরূপ কখনো সহ্য করতে পারেননি এবং তাই তাঁর সুদূরের আহ্বানে যেমন 'বলাকা'র স্পর্শ কিছু পাই, তেমনি গণতান্ত্রিক কবি, মুটে-মজুর-হউরের কবি, তাদের কর্মে জীবন এমনভাবে উৎসর্গ করেছেন যে সেই কর্মযজ্ঞ ছাড়া আর কোন জগৎ তাঁর কাছে পরিচিত নয়। কবি তাই বলেন 'সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি / আর খালকাটি ভাই পথ বানাই, / স্বপ্ন বাসরে বিরহিনী বাতি / মিছে সারারাত পথ চায়, / হায় সময় নাই !' সে যাইহোক, প্রথমার যুগে কবি প্রেমেন্দ্রের বহু কবিতায় 'বিশ্বজোড়া হাহাকারে বাজে নব-স্তোত্র'। এই পর্বে প্রেমেন্দ্র বলাকার ছন্দও অনুসরণ করেছেন কোন কোন কবিতায় ঃ নটরাজ, যৌবন-বারতা, স্মৃতি, বিস্মৃতি, লুপ্ত প্রভৃতি কবিতায় তার উদাহরণ মেলে ঃ 'জীবন মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস শুনিস্ কিরে কানে ? / মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে ! / বৎসহারা কোন্ সাহারা হাহা করে হাহা করে / কোন সাগরে ঝড় উঠেছে মেঘ গরুড়ে আকাশ আড়াল করে। (নটরাজ / প্রথমা) এর পাশে রবীন্দ্রনাথের বলাকার '৩৭ সংখ্যক কবিতা দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন, / ওরে উদাসীন, / ঐ ক্রন্দনের কলরোল / লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল'। সম্রাটের যুগে কবি প্রেমেন্দ্র 'তামাসা' (বিজলী, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১০৪২) বলে একটি কবিতা রচনা করেছেন যেখানে রুক্ষ পৌরুষ গদ্যে তিনি বিচিত্র ভাবনা পদ্ধতি জানিয়েছেন, জানিয়েছেন 'বিধাতা ভাবেন, ইলেকট্রনের গণিতে / ছায়াপথ ছাড়িয়ে / অসীম আকাশ জুড়ে। এবং এই কবিতার জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে

প্রশংসা পেলেন। 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যের একটি কবিতায় কবি প্রেমেন্দ্র যথেচ্ছভাবে রবীন্দ্রনাথের 'সেঁজুতি' কাব্যের 'জন্মদিন' কাব্যের কিছু পংক্তি বিধিসম্মতভাবে প্রয়োগ করেছেন। যেমন—'ক্ষুধযারা, লুব্ধযারা, মাংসগন্ধে মুগ্ধযারা / একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা' 'শ্মশানের প্রান্তচর' এবং 'মানুষ জন্তুর হুহুঙ্কার' এ ছাড়া 'আরোগ্য' কাব্যের একটি কবিতার পংক্তি 'এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি' ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া 'কখনো মেঘ' কাব্যের 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতায় তিনি গীতবিতানের 'চির আমি' কবিতার একটি পংক্তি 'নাই বা মনে রাখলে · ' উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তিনি যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন এ কাব্যে 'পঁচিশে বৈশাখ' তার উজ্বল দৃষ্টান্ত। কবি জানিয়েছেন, 'বলেছিলে নাই বা মনে রাখলে···' / সে কথা যে মিথ্যে তা'ত জানতে। / ** দিয়েছ সুর দিলে ভাষা / আকাশ লোভী অসীম আশা / প্রণাম লহ মুগ্ধ মনের / আজ পঁচিশে বৈশাখে'। এই কবিতায় মুগ্ধ ভক্তের বিনম্র আত্মনিবেদন বাণীমূর্তি লাভ করেছে। আর অন্য একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কাছে সুপ্তির জড়তা ভেঙ্গে দেবার জন্য আবেদন রেখেছেন। কবি বলেছেন, 'তুমি আরো কিছু দিলে / অনির্বাণ আরেক আকুতি, / সমস্ত তমিস্রা ঠেলে / প্রপঞ্চের প্রাণ খুঁজে ফেরা / দুঃসাহসী দ্যুতি। / ** সে দ্যুতির স্পর্শ লেগে / এ সৃষ্টিও হলো মধুময় / এ জীবন শাশ্বত প্রভাত / সত্তার গহন কেন্দ্রে সুপ্তির জড়তা দাও ভেঙে / হে রবীন্দ্রনাথ! (রবীন্দ্রনাথ / কখনো মেঘ । কবির বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথই দীর্ঘ প্রসুপ্তির জড়তা নাশ করতে পারে। ঐ কাব্যে অন্য একটি কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে একটি প্রিয় উচ্চারণ দৃঢ় হয়ে ওঠে—রবীন্দ্রনাথ সংক্ষুব্ধ জীবনের প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়, যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট জীবনের অনেক অতৃপ্ত প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের জৈবনিক প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লেষ হয়ে ওঠে। তাই কবির কণ্ঠে শোনা যায়, 'সত্তার অতৃপ্ত প্রশ্ন বিদ্রোহ যন্ত্রণা বিধুর / উদ্‌ভ্রান্ত বিক্ষুব্ধ যুগে কখনো হয়ত / নাম নেয় রবীন্দ্র ঠাকুর'। আবার কখনো দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের 'প্রহাসিনী' কাব্যের 'রঙ্গ' কবিতায় ছকে একটি কবিতার কাঠামো রচিত। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'এতো বড় রঙ্গ, জাদু, এতো বড় রঙ্গ / চার মিঠে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ। বরফি মিঠে জিলাবি মিঠে, মিঠে শোন পাপড়ি / তাহার অধিক মিঠে, কন্যা, কোমল হাতের চাপড়ি'। অবশ্য রবীন্দ্রনাথও এই কবিতাটি প্রাচীন 'এতো বড় রঙ্গ' ছড়ার অনুকরণে লিখেছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রও লিখলেন, 'এত বড় রঙ্গ যাদু / এতো বড় রঙ্গ! / নিজেই আগুন জেবলে আবার / নিজেই হই

পতঙ্গ ! / ওপরতলায় আসর মেলা / চলছে সতরঞ্চখেলা। / ঘুঁটি কিন্তু নীচের তলায় / যা নড়ে তার ব্যঙ্গ ! এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রেমেন্দ্রের একটি মাত্র বৈসাদৃশ্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের এই ছড়ায় হাল্কা রস আছে, বিপরীত পক্ষে প্রেমেন্দ্রের ছড়ায় সামাজিক অবস্থা যেমন চিত্রিত, অন্যদিকে গভীর ও শাশ্বত জীবনবোধও উল্লিখিত হয়েছে। আবার অন্য একটি কবিতায় শব্দাতীত মহাপ্রশান্তির ঝলক ধ্যানমৌনীরূপে শুধুমাত্র একটি কাকের ডাকে বিস্মিত ; ক্ষণে ক্ষণে তবু সব সুর / কেটে দিতে পারে এক কাক-ডাকা গহন দুপুরে।··· উত্তরিতে পারে এক নিষ্কম্প নিথর / নভো-নীল অপার বিস্ময়ে। (কাক ডাকে / ফেরারী ফৌজ)। এ যেন মোহাবিষ্টতা থেকে মোহহীনতায় উত্তরণ। সীমা থেকে অসীমে যাত্রা। রবীন্দ্রনাথও কাকের ডাকের মধ্যে শুধু সময়চেতনা পেয়েছিলেন ; আর এক ছিল কাক / তার ডাক / সময় চলার বোধ / মনে এনে দিত / · (স্কুল-পালানো / আকাশ প্রদীপ)।

এই কাব্যগুলির পাশে কবির রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত প্রবন্ধাবলীও কম নয় : ১. নেপথ্য নায়ক ২. রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে নিসর্গ ৩. রবীন্দ্র-কাব্যে গতি ৪. রবীন্দ্রনাথ ও শিশুসাহিত্য ৫. পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ ৬. সুরের আড়ালে ৭. রসিক রবীন্দ্রনাথ ৮. হাসলে মুক্তো ইত্যাদি। প্রবন্ধগুলির মধ্যে যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রতি আত্যন্তিক ভক্তি উৎসারিত, তেমনি তীক্ষ্ণ সমালোচনারও সীমা নেই। কল্লোল কালিকলম দলের লেখকরা যে রবীন্দ্র বিরোধী ছিলেন না, সে কথা স্পষ্ট করে বলতে গিয়ে লিখলেন যে তাঁরাতো রবীন্দ্র বিরোধী নয়ই বরং রবীন্দ্রনাথই তাঁদের প্রেরণা। তাঁর বক্তব্য : 'যে সব অভিযোগ তখন এই সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের নামে উঠেছে তা সর্বৈব ভ্রান্ত, তাও হয়ত নয় কিন্তু রবীন্দ্র বিরোধের দুর্নামটা সত্যিই ভিত্তিহীন ও মর্মান্তিক। এ যেন নৌকোর পালকে হাওয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বলা, যে ঢেউ তটের দিকে ফেনায়িত হয়ে ছোটে তাকে সমুদ্র-বৈরী নাম দেওয়া, ('নেপথ্য নায়ক')। এবং একথা নিতান্ত সত্য রবীন্দ্রনাথই তৎকালীন সাহিত্য সৃজনের নেপথ্য নায়কই। 'রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে নিসর্গ'' প্রবন্ধে যে অপূর্ব উপমায় কবি প্রেমেন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সাধারণ মানুষের জীবন চেতনা তুলে ধরেছেন তা বাংলাসাহিত্যে বিরল। তিনি মনে করেন, 'নদী যে দৃষ্টিতে তীরকে দেখে, গল্প-রচয়িতা হিসাবে তিনি তখন সেইভাবেই জীবনকে দেখেছেন। লোকালয় সংলগ্ন অথচ তা থেকে বিচ্ছিন্ন, বিশাল বেগবান নদীর মতই একদিকে পরম অন্তরঙ্গ আর একদিকে একান্ত নির্লিপ্ত উদাসীনভাবে তিনি তাঁর গল্পের মানুষের খুঁটিনাটি থেকে

বিরাট ও বিশেষ সমস্ত ঘটনা জেনে গেছেন'। রবীন্দ্রনাথকে তিনি বিচার করেছেন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে। তাইতো 'রবীন্দ্র কাব্যে গতি' প্রবন্ধে গতিচেতনার সঙ্গে ভ্রমণ-পিপাসা যে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত তা বলতে পেরেছেন। তিনি মনে করেন 'এ গতিচেতনার ভিত্তি তাঁর (রবীন্দ্র-নাথের) জীবন-দর্শন আর শারীরিক পাদনেকম্ না নড়ে বসেও এ চেতনায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব'। আবার শিশু সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ শিশুসাহিত্য রচনা করতে গিয়ে শিশুর ভাষা ব্যবহার করেছেন—এই কষ্টসাধ্য কাজ মহামানব ছাড়া আর কেউ পারে না তাই তাঁর দৃষ্টিতে। এ ভাষা আয়ত্ত শুধু মহাপুরুষদের, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের মত কবি সাহিত্যিক হ'ন বা হ'ন যিশুখ্রীষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের মত পরম সাধক'। ('রবীন্দ্রনাথ ও শিশুসাহিত্য')। রবীন্দ্রনাথ ধারাবাহিক আত্মজীবনী লিখে যাননি। এবং তার আত্মজীবনী রচনার বিস্তারিত উপ-করণও দুষ্প্রাপ্য কিন্তু প্রেমেন্দ্র মনে করেন তাঁর পত্রাবলীই তাঁর আত্মজীবনী। তাই তাঁর বক্তব্য স্থির প্রত্যয়ী দিক্‌দর্শন ঘটিয়েছে। যাঁরা তাঁর আত্মজীবনী বা পঠিত পুস্তকের তালিকা পাননি তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'আমার ত মনে হয় এ যেন তীর্থ দর্শন সেরে এসে ছাপানো টাইম টেবল না পাওয়ার আক্ষেপ। তীর্থ মানে ত স্টেশনের খবর, গাড়ীবদলের হদিশ আর পাণ্ডার নাম ঠিকানা নয়। রবীন্দ্রনাথের মত মানুষের জীবনও তেমনি নয় শুধু কটা বাইরের ঘটনা তারিখের ফিরিস্তি। স্থূল কৌতুহল মেটাবার ঘটনা নির্ভর বিবরণ নয়, রবীন্দ্রনাথের কাছে আরো গভীর কিছু দুর্লভ কিছু আমরা পেয়েছি—পরামাশ্চর্য এক চেতনা-প্রবাহের প্রায় নিত্যকার দিনলিপি'। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে মত্ত হয়ে গানের সম্পূর্ণ মূল্য দিতে মানুষ ভুলে যায়। তাই এক অপূর্ব উপমায় তা চিহ্নিত করেছেন কবি প্রেমেন্দ্র; 'মেঘের বাহার দেখতে পিছনের সূর্যের কথা অনেক সময়েই ভুলে যাই। মেঘ সূর্যেরই সৃষ্টি। আর সেই মেঘের আড়ালেই সূর্য ঢাকা পড়ে'। এই বৈজ্ঞানিক সত্য রবীন্দ্রনাথের গানের পক্ষে নির্মমভাবে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এখন সুর প্রধান, আর কথা অপ্রধান হয়ে পড়েছে। ঠিক এমনি করেই তিনি রবীন্দ্রনাথের হাল্কা হাসি ও রসিকতার দিকও লক্ষ্য করেছেন। এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর একটি নিটোল মন্তব্য তাই স্মরণীয় হয়ে থাকবে: 'রবীন্দ্রনাথ দিকে দিকে অনেক না হলে অমন একমেবাদ্বিতীয়ম্ হতেন না। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী-প্রতিভার সামগ্রিক রূপটিই রবীন্দ্রনাথ। এমনকি তাঁর শ্রদ্ধা তাঁর এক পৃথক প্রবন্ধে ঘণীভূত হয়েছে। তিনি পঁচিশে বৈশাখকে কেন্দ্র করে 'গ্রন্থপার্বণ' প্রচলন করার সুপারিশ করেছেন। তাঁর

স্থির ভাবনা সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ একদিন নিশ্চয়ই করবে সন্দেহ নেই। 'এই পঁচিশে বৈশাখকে ঘিরে, তাঁকে কেন্দ্র করে একটি অপূর্ব উৎসব অনায়াসেই গড়ে তোলা যায় না কি? কবিগুরুর স্মৃতি আমাদের মধ্যে অটুট ও জাগ্রত রাখতে গেলে তাকে আমাদের জীবনযাত্রার ছন্দে মিশিয়ে দিতে হবে। যেমন করে কার্তিকের কুহেলি-ঢাকা আকাশে আমরা আকাশ প্রদীপ তুলে ধরি অমৃত চক্রের আবর্তনে এই বিশেষ দিনটাকে অবলম্বন করে একটি পার্বণ তেমনি গড়ে তুলতে হবে'। ('গ্রন্থ পার্বণ')

এই প্রবন্ধগুলি ছাড়া—কবিতার মধ্যে 'রবীন্দ্রনাথ' উপস্থিত একই মানসিকতায়—মুগ্ধ ভক্তের বিনম্র সমর্পণের মধ্যে। তাঁর মন্তব্য শাশ্বত সত্যে দ্যুতিময়। তিনি বললেন:

'রবিঠাকুর এলেন গেলেন,
রইল এমন আভা—
সময়ই আর ম্লান হবে না
ও নাম ভুলবে না বা'
('রবিঠাকুর' / চাঁদ-তারা-জোনাকিরা)

রবীন্দ্রনাথকে কোন কাল গ্রাস করতে পারবে না। যে আভা তিনি পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন তা অম্লান থাকবে। আর একটি ছড়ায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্বাদ মেলে। প্রেমেন্দ্র বলেন, পুজোর সময় কোথাও যাওয়ার জন্য মানুষের মন উন্মন হয়ে যায়, কিন্তু সাধারণ সত্য যে ঘরের পাশে নৈসর্গিক দৃশ্য তা বর্ণনা করলেন, 'কেমন করে সে দেশ যায়? / কায়দাটা আজগুবি, / দরজা খুলে দাঁড়াও শুধু / বলছি চুপিচুপি'। (যাচ্ছি পুজোয় / চাঁদ-তারা-জোনাকিরা) এই দরজা খুলে প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তিতে সে অনুভূতির সন্ধান পাওয়া যায়। 'বহুদেশ গেছি বহুব্যয় করি / দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু, / দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া / ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া / একটি ঘাসের শীষের ওপর একটি শিশির বিন্দু'। কবি এই ঘাসের ওপর একটি শিশির বিন্দুর যে মহনীয় সৌন্দর্য শুধুমাত্র দরজা খুললেই পাওয়া যাবে এই চিন্তায় প্রেমেন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের অনেক সমীপবর্তী।

··৩···

রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক চেতনায় ছিল দূরচারিতা। তিনি নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। যাত্রা করেছেন সুদূরে। লক্ষ্য যেমন স্থির নয়, যাত্রা শুরু করার সময়ও স্থির নয়। তাঁর 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের

পিয়াসী' (বিচিত্র, ৬৫) বা 'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী ? / বলো কোন্ পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।' 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'/'সোনার তরী') অথবা 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে' (বলাকা / বলাকা) প্রভৃতি কবিতার পংক্তিতে যেমন দূরচারিতা প্রকাশিত, তেমনি তাঁর যাত্রা-কালও 'বহুযুগের ওপার থেকে' (প্রকৃতি ; ৮১)। কবি প্রেমেন্দ্রও যাত্রা করেছেন নিরুদ্দেশে। তিনি বলেন, 'নৌকা মোদের নোঙর জানেনা. / শুধু চলে স্রোতে ভাসি' ('সুদূরের আহ্বান' / 'প্রথমা')। যুগযুগ ধরে তিনিও পথ-পরিক্রমা করে চলেছেন অরণ্য-পাহাড়-সাগর-পাতাল নদী-পার হয়ে মানুষের মনে তাঁর যাত্রা শেষ। কবি বলেন. 'আমি পথ বানালাম অরণ্য ফুঁড়ে / আমি পথ বানালাম পাহাড় চিরে, / আমি নদী ডিঙিয়ে গেলাম, আমি সাগর বেঁধে দিলাম, / বাতাস জিনে নিলাম, / আমি যুগ থেকে যুগান্তরে দেশ থেকে দেশান্তরে মনের সড়ক তৈরী করলাম, / আমার তবু থামা হবে না, / পথই যে আমার প্রাণ ; আমার অসীম পথের পিপাসা' ! ('রাস্তা' / 'প্রথমা')। আবার বিজ্ঞানী মানসের অধিকারী প্রেমেন্দ্র 'দূরতম নক্ষত্রের পথ' খুঁজে চলেছেন মহাশূন্যপরিক্রমার উদ্দেশ্য নিয়েই। পরন্তু, রবীন্দ্রনাথের কবিতার যেমন 'আমিত্ব' (নিখিল পুরুষ সত্তার 'আমি', কবির ব্যক্তি 'আমি' নয়) প্রকাশিত, রবীন্দ্রোত্তর কবিতায় তেমনি সার্বজনীনতা প্রতিভাত। রবীন্দ্রনাথের 'সীমার মাঝে অসীম, তুমি বাজাও আবার সুর, / আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর', ('সীমায় প্রকাশ' / 'গীতাঞ্জলি') বা 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ ; ('সবুজ' / 'শ্যামলী') বা 'মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি / নিত্যকালের আলো আমি / সৃষ্টি উৎসবের আনন্দধারা আমি' (শেষ স্তবক, ২২) কবিতায় ব্যক্তিগত মূল্যবোধ প্রচারিত, আধুনিক কবি হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যে সার্বজনীন মূল্যবোধ চিত্রিত। সাধারণের সামিল হয়েছিলেন তিনি রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে প্রথমেই। তিনি বলেন, 'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের / মুটে মজুরের, / আমি কবি যত ইতরের'। ('কবি' / 'প্রথমা')। হুইটম্যানের মতো তিনিও বলতে পেরেছিলেন, 'পৃথিবীর ভাইবোন মোর / এই বিশালের গ্রহে, মোর কান্না রেখে যাই আজ, / একটি বাসনা আর. / পশ্চাতে আসিছে যারা / তারা যেন ধরণীর এ কলুস দেখিতে না পায় ; মোদের জলে শেষ হোক সব তাপ গ্লানি, / শেষ হোক মানব-আত্মার এই কাতর আকুতি, / আমাদের বেদনায়, / তারা যেন সবে ভালোবাসে।' ('প্রার্থনা' / 'প্রথমা')।

কবি প্রেমেন্দ্রের মর্ত-চেতনার উৎস প্রেমচেতনায়। প্রথমত, নারী তাঁর

কাছে ভোগ্যবস্তুরূপে উপস্থিত। তিনি বলেন, 'যৌবনের মায়ালোকে / অনাদি ক্ষুধার সেই অনির্বাণ জ্বালা নিয়ে চোখে / এস নারী, আরো কাছে এস / বুকে বুক রেখে শুধু ক্ষণিকের তরে মোহভরে ভালবাসো।' ('যৌবন বারতা' / 'প্রথমা') শুধু তাই নয় এই ইহবাদিতা তাঁর কাছে প্রেমেন্দ্রর শরীরীরূপে হয়ে ধরা দিয়েছে। 'ওরে অন্ধ, ওরে হতাশ / লুট করে নে যেথায় যা পাস ; / আকাশ বাতাস, / প্রেমের প্রকাশ, / নারী দেহের রূপের বিকাশ, / যেথায় যা পাস ('ইহবাদী' / 'প্রথমা'), অথচ তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমে যাত্রা করেননি। রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'হাত ধরে মোরে তুমি / লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দনভূমি / অমৃত আলয়ে। / সেথা আমি জ্যোতিষ্মান / অক্ষয় যৌবনময় দেবতা সমান, / সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা ('প্রেমের অভিষেক' / 'চিত্রা') বা 'মানসীর' চিরন্তন প্রেমের জগতেও যিনি যাত্রা করেননি। প্রেমেন্দ্রের প্রেমের তপস্যা শুধু ক্ষণিকের জন্য নয়, সারা জীবনের। তিনি বলেন, 'মনে করি ভালোবাসব, / শপথ করি এ জীবন হবে প্রেমের তপস্যা, ('সংশয়' / 'প্রথমা'। অবশ্য একটি জায়গায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাদৃশ্য মেলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'তাসের দেশ'-এর একটি গানে বলেছেন, 'নাম-না-জানা-প্রিয়া / নাম-না-জানা ফুলের মালা নিয়া হিয়ায় দেবে হিয়া।' ··এই অচেনা অজানা প্রিয়াকে ভালোবাসা প্রেমেন্দ্রের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। তিনি একটি কবিতায় বলেন, 'শুধু সকরুণ প্রেমটিরে স্মরি', / আজি তবে সযতনে হাস্যটানি ব্যথা ম্লান মুখে। নিদারুণ কপট কৌতুক, / রঙীন বিষের পাত্র ভুলি ধরি / যাব পান করি। অবিশ্বাসী প্রিয়ারেও অসঙ্কোচে দিব আলিঙ্গন, / যে অধর করিল বঞ্চনা / তাহারেও করিব চুম্বন'। ('স্বপ্নদোল' / 'প্রথমা') কবি 'জীবন শিয়রে বসি দোলা দেয় যে স্বপ্ন সুন্দরী' তাকেই স্মরণ করে জীবন সার্থক করতে চান।

প্রেমেন্দ্রের প্রেমচেতনার মধ্যে মর্ত্যচেতনা বিধৃত। এই হাসি-অশ্রু মিশ্রিত পৃথিবীর বুকে কবি ফিরে আসতে চান। বীভৎসতা, কদর্যতা, অত্যাচার প্রত্যক্ষ করতে চান না। তিনি একটি কবিতায় ('যদি ফিরে আসি' / 'প্রথমা') জানালেন বৃদ্ধ নগরীর নগণ্য পল্লীতে দীনা কোন পথের নটীর কোলেই জন্ম নিতে চান। অস্পৃশ্যতা বোধহীনতা তাঁর বৈশিষ্ট্য। অথচ রবীন্দ্র জানালেন, মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে / মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাহি' (প্রাণ /)। এই মানব অবশ্য সার্বজনীন এতে সর্বস্তরের মানুষের কথা সূচিত হলেও যেন অবহেলিত মানুষের কথা অনুক্তই থেকে যায় ? পরন্তু যন্ত্র-সভ্যতার যেমন প্রেমেন্দ্র বিরোধী রবীন্দ্রনাথও তেমনি। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, 'দাও ফিরে সে অরণ্য লহ এ নগর /

লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর' ('সভ্যতার প্রতি' / 'নৈবেদ্য') প্রেমেন্দ্রও জানিয়েছেন, আরো এক পা এগিয়ে যন্ত্রসভ্যতার ভয়াবহরূপ উদ্‌ঘাটন করে। 'যন্ত্রের জটিল পথে / বিকলাঙ্গ জীবনের / হেরি শুধু ব্যঙ্গ সমারোহ' ('আশীর্বাদ' / 'প্রথমা')

রবীন্দ্রনাথের চেতনায় মৃত্যুধরা দিয়েছে এক মহনীয় রূপ নিয়ে। কবি কত সহজে বলতে পেরেছেন, 'জীবন্ত মরণ মোরা মরণের ঘরে থাকি / জানিনে মরণ কারে বলে' । ('অনন্ত মরণ' / 'প্রভাতসঙ্গীত') । আবার মরণের সঙ্গে আলিঙ্গনও করতে চেয়েছেন। মরণ তাঁর কাছে শ্যাম সমান। শুধু তা নয় রবীন্দ্রনাথের কাছে জীবন ও মরণ উভয়ই সমানভাবে ভালোবাসার যোগ্য। তিনি একটি কবিতায় জানালেন, 'জীবন আমার / এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়, / মৃত্যুরে এমনি ভালোবাসিব নিশ্চয়। ('নৈবেদ্য' ৯০) প্রেমেন্দ্রও মৃত্যুকে যৌবনবতী প্রিয়ারূপে পেতে চান। তাই তিনি বলেন, 'মৃত্যুর মৌতাতে বুঁদ হয়ে গেছি সব / রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই !' ('নীল-কণ্ঠ' / 'সম্রাট') কবি মনে করেন, 'মৃত্যু মানুষের শেষ সার আবিষ্কার' ('নীলকণ্ঠ' / 'সম্রাট') ।

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে প্রেমেন্দ্রের আধ্যাত্মিক চেতনার সাদৃশ্য একটি জায়গায় মেলে। কবি প্রেমেন্দ্র বলেছেন, ভগবান পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে মানুষের দুঃখের সামিল হয়েছেন। 'যত কান্না ধরণীতে/তার মাঝে তুমি কাঁদ এই শুধু জানি— /আর ধন্য আপনাবে মানি' ('অপর্ণ' / 'প্রথমা' রবীন্দ্রনাথও বলেন, 'তাই তোমার আনন্দ আমার পর / তুমি তাই এসেছ নীচে, / আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে ('গীতাঞ্জলি' ১২১ নং) বা 'আমার মাঝে তোমার লীলা হবে, / তাইতো আমি এসেছি এই ভবে ; ('গীতাঞ্জলি' ১৩০ নং) এ ছাড়া কবি প্রেমেন্দ্র মনে করেন এ জীবনই মুখ্য মুক্তি বা মোক্ষ মুখ্য নয়। কবি জানালেন, 'মরদেহের চেয়ে মূর্খ, মোক্ষ নয় মহার্ঘ্য রে' ! ('ইহবাদী' / 'প্রথমা' রবীন্দ্রনাথও একটু অন্যভাবে জানালেন, মুক্তি নানাবেশে নানাভাবে মানুষের কাছে আসে। কেউ গানে মুক্তি পায়, কেউ পায় আপন কর্মে। আবার এই মুক্তি 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়' হয়ে দেখা দেয়।

রবীন্দ্রনাথের কাছে সূর্য কখনো জ্যোতিষ্ক, কখনো প্রেমাস্পদ, কখনো বিরাট প্রাণপুরুষের অনুগত চর বা ধেনু বা মালা। এই জ্যোতির্ময় সত্তা প্রেমের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে : 'প্রেমের ডাক শুনি এসেছে চরাচর / এসেছে রবি শশী, এসেছে কোটী তারা' ('প্রভাত উৎসব') কড়ি ও কোমলে এই সূর্য রোম্যান্টিকতাময় হয়ে উঠেছে : 'এ প্রভাত মনে হয় / আরেক প্রভাতময়, /

রবি যেন আর কোন রবি' ('যোগিয়া') কিন্তু প্রেমেন্দ্রর কাছে 'সূর্য'' সেই অবতার যিনি সাধুদের রক্ষা ও দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করবেন। কবি বলেন, 'হে মহাকাল, তোমার অনন্ত পারাপারে / আমরা ক্ষণিকের বুদবুদ / তবু সেই সূর্য শিখা যে আমাদের মাঝে / প্রতিফলিত হয় / এই আমাদের গৌরব (সূর্যবীজ / সাগর থেকে ফেরা)। সূর্যচেতনায় রবীন্দ্রনাথ ও প্রেমেন্দ্রর একটি সাংমানিক পার্থক্য বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথ সূর্যের মধ্যে আত্মানুসন্ধান করছেন ('প্রতিদিন সূর্যোদয় পানে / আপনার খুঁজিছ সন্ধান।' ২নং কবিতা 'জন্মদিনে') কিন্তু প্রেমেন্দ্র মানুষের মধ্যে সূর্য সন্ধান করছেন। কবি প্রেমেন্দ্র বলেন, 'সূর্য খুঁজি কোথায় ? / শুধু আকাশে নয়, / নয় মৃত্তিকায় হরিৎ উল্লাসে / পৃথিদ পুঞ্জের পুঞ্জিত তাপ শিলাতেও নয়। / খুঁজি এই মানুষের মধ্যে গহন পরম অনাদি সূর্য' ('একটি ভাস্বর মানুষ') অথবা কিন্নর। রবীন্দ্রনাথের কাছে সূর্য অখণ্ডজ্যোতিঃপ্রাপ্তির মাধ্যম কিন্তু প্রেমেন্দ্রর কাছে সূর্যপ্রাপ্তির মাধ্যম মানুষ।

·· ৪

রবীন্দ্রনাথ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যে পত্রালাপ হয়েছিল। সেই পত্রগুলির মধ্য দিয়ে উভয়ের মানসিকতা প্রতিভাত হয়েছে। ছেলেমেয়েদের সচিত্র পত্রিকা 'রংমশাল' এর পক্ষে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে লেখা চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন (তাং ১২।৯।১৯৩৬) দ্বিতীয়পত্র ১৯৪০ সালে 'নিরুক্ত' সম্পাদনার সময়। এই চিঠিতে বাংলা কবিতার সম্পর্কে কিছু বক্তব্য তিনি পেশ করেছিলেন : বর্তমান বাংলা কবিতার কোথাও কোথাও যে নকল করা বাতুলতার হুজুগ চলেছে তাতে আপনার সহানুভূতি ও স্নেহ থাকতে পারে না বলেই আমাদের ধারণা। আমাদের মনে হয়েছে গালাগাল দিয়ে নয়, সত্যকার কাব্যাদর্শ যেখানে সম্মানিত এমনতর বাংলা কাব্যের বাহন গড়ে তোলবার চেষ্টা করেই হুজুগ ব্যর্থ করা যায়।' প্রসঙ্গত বলা যায় রবীন্দ্রনাথও প্রেমেন্দ্রকে লিখেছেন, তাঁর 'ধূলিধূসর' গল্পগ্রন্থ প্রসঙ্গে। তিনি লিখেছিলেন, প্রথম গল্পটি পড়েই দেখা গেল, এতো নেহাৎ পায়ে হাঁটা দাগপড়া জীবনের কথা নয়। এতো সচরাচরের বাহির এলাকায়। তারপর দেখলুম অন্যান্য সব গল্পেই সচরাচরত্বের ভিতর থেকে প্রত্যাশিতের উঁকিমারা মুল কোথাও বা ব্যঙ্গ হাস্যে কোথাও বা দাঁত খিঁচিয়ে দেখা দিয়েছে। সেইটেই তাঁর বিশেষত্ব, ধূলির আবরণটা নয়'। (১৯।৩।৩৯) দ্বিতীয় পত্র ৮।৪।৩৯ তারিখের। সেই পত্রে 'প্রথমা' কাব্য সম্পর্কে তাঁর মত ; তোমার 'প্রথমা'র কবিতাগুলি আগুনে ঢালাই করা হাতুড়ি পিটানো কবিতা - এদের ভিতরে পুরুষ অদৃষ্টের অগ্নিস্রাব জমে গিয়েছে। —জীবনের

যে ভূভাগে মরুর অধিকার পাকা হয়নি, যেখানে ফুল ফোটে, ফল ফলে, সেখানেও কবি বাঁশি বাজাবার বায়না পেয়েছে এ কথা মনে রেখো—কেবলি দুন্দুভি বাজাবার পালা তার নয়'। তৃতীয় পত্র ২২।৮।৪০ তারিখের কবি নিরুক্ত প্রকাশনাকে স্বাগত জানিয়েছেন। সমকালীন সাহিত্যে যে একধরনের কবি যশঃপ্রার্থীর সংক্রামকতা সাহিত্যের আবহাওয়াকে দূষিত করছে কবি সমালোচনা করেন। সুস্থসাহিত্য প্রকাশকে তিনি অভিনন্দিত করেছেন। কিছুকাল থেকে ভাষার বিকৃতি ছন্দের স্খলন ও ভাবের দুর্বোধ্য অসংলগ্নতা নিয়ে অকবির পথে কবি যশঃপ্রার্থীর সংখ্যা অবাধে বেড়ে চলেছে। সাহিত্যের এই মারীর সংক্রামকতা এখনকার বাতাসকে অধিকার করেছে সুতরাং বাহির থেকে কোনো প্রতিকার চেষ্টা ব্যর্থ হবে। রুগ্ন-সাহিত্য হয় আপনি আপনার সাংঘাতিকতাকে নিঃশেষিত করে দেবে নয় ত বিদেশী সাহিত্যের পালে যখন হাওয়া দেবে উল্টোদিকে তখন দেখাদেখি এরাও সেইদিকে পালের মুখ ফেরাবে। তোমাদের রচনায় তোমরা সাহিত্যের সুস্থ স্বরূপ প্রকাশ করতে থাকো'।[২] কবি প্রেমেন্দ্র কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি কত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তার দৃষ্টান্ত যদিও কাব্য, ছড়া-কবিতায় তাঁর প্রভাব অনস্বীকার্য।

···৫···

কবি জীবনের 'দেবতার জন্ম' কবিতায় প্রথম বলাকার প্রভাব একদিন সূচিত হয়েছিল যেখানে প্রেমেন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রতিভাত ছিল—। রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাব-মুক্ত হয়ে প্রেমেন্দ্র অনেক নতুন আলোক সাহিত্যে ছড়িয়েছেন—যাতে তাঁর স্বকীয়তা বিরাজমান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে এক অনিন্দ্যসুন্দর পুরুষ, এক জ্যোতির্ময় সত্তা যা অন্ধকার আলোকিত করে।

কল্লোলযুগ ও প্রেমেন্দ্র মিত্র

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত "কল্লোলযুগে" লিখেছেন, বস্তুত কল্লোলযুগে এ দুটোই প্রধান সুর ছিল, এক, প্রবল বিরুদ্ধবাদ ঃ দুই, বিহ্বল ভাববিলাস। একদিকে অনিমাধীন উদ্দামতা, অন্যদিকে সর্বব্যাপী নিরর্থকতার কাব্য। একদিকে সংগ্রামের মহিমা, অন্যদিকে ব্যর্থতার মাধুরী। আদর্শবাদী যুবক প্রতিকূল জীবনের প্রতিঘাতে নিবারিত হচ্ছে—এই যন্ত্রণটা সেই যুগের যন্ত্রণা। শুধু বন্ধ দরজায় মাথা খুঁড়ছে, কোথাও আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না, কিংবা যে জায়গায় পাচ্ছে তা তার আত্মার আনুপাতিক নয়—এই অসন্তোষে এই অপূর্ণতায় সে ছিন্নভিন্ন। বাইরে যেখানে যা বাধা নেই সেখানে বাধা তার মনে, তার স্বপ্নের সংগে বাস্তবের অবনিবনায়। তাই একদিকে যেমন তার বিপ্লবের অস্থিরতা, অন্যদিকে তেমনি বিফলতার অবসাদ।

যাকে বলে 'ম্যালাডি অফ দি এজ বা যুগের যন্ত্রণা। তা 'কল্লোলের' মুখে স্পষ্ট রেখার উৎকীর্ণ! আগে এর প্রচ্ছদপটে দেখেছি একটি নিঃসম্বল ভাবুক যুবকের ছবি, সমুদ্রপারে নিঃসঙ্গ ঔদাস্যে বসে আছে ফেন-উত্তাল তরঙ্গ শৃঙ্গটা তার থেকে অনেক দূরে। তেরোশ একত্রিশের আশ্বিনে সে-সমুদ্র একেবারে তীর গ্রাস করে এগিয়ে এসেছে, তরঙ্গ তরল বিশাল উল্লাসে ভেঙে ফেলছে কোনো পুরোনো না পোড়ো মন্দিরের বনিয়াদ। এই দুই ভাবের অদ্ভুত সংমিশ্রণে ছিল 'কল্লোল'। কখনো উন্মত্ত, কখনো উন্মনা। কখনো সংগ্রাম, কখনো বা জীবন বিতৃষ্ণা। প্রায় টুর্গেনিভের চরিত্র ঃ ভাবে শেলীয়ান কর্মে হ্যামলেটিশ।[১]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান (১৯১৮) ও তাসখন্দে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বে প্রবাসী ভারতীয়দের কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার (১৯১৯) সংগে সংগে ভারতীয়দের মনের গহনে এলো সমাজতন্ত্রের নবতর স্বাদ, নবতর আন্দোলন! রাষ্ট্র চিন্তা ও সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে এদেশে সমাজতন্ত্রবাদ সোস্যালিজম্ এর ধারণা প্রবেশ করেছে। অবশ্য সাহিত্যে তার অনুপ্রবেশ নিতান্ত সাধারণভাবেই। যাইহোক্ 'সোস্যালিস্ট ভাবস্রোতের ঢেউ আজকাল আমাদের দেশেও পৌঁচেছে,[২] যদিও অনেকে এটা নিতান্ত ক্ষোভের কথা

মনে করেন। অনেক চিন্তাশীল শিক্ষিত লোক এ সম্বন্ধে আগ্রহ বা আলোচনাকে পশ্চিমের সস্তা অনুকরণ বলে ব্যঙ্গ করেছেন—এই প্রসঙ্গে প্রাচ্যের ও সর্বোপরি ভারতের বৈশিষ্ট্যের কথাও আমরা শুনতে পাই। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা বিদেশ থেকে সাহিত্য, সামাজিক প্রথা, শিক্ষা পদ্ধতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে নতুন নতুন মত ও আদর্শ আহরণ করতে কুণ্ঠিত হন না—ভারতবর্ষের সর্বত্র জাতীয়তাবোধের প্রসারের বিপুল চেষ্টা পাশ্চাত্য প্রভাবের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। সোস্যালিজমুন-এর বিরুদ্ধে অনেক প্রবল যুক্তি আছে—কিন্তু তাকে বিদেশী বলে বর্জন করার উপদেশ শ্রেণীস্বার্থের সুন্দর উদাহরণ ছাড়া আর কেছু নয়।[৩]

বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে এই ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রবাদের শুরু থেকেই কাব্য-ছোটগল্প ও উপন্যাস জগতের রূপ-রস-বর্ণ পরিবর্তিত হোল। ১৯১৪-১৫ সালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শশাঙ্ক', 'ধর্মপাল', 'ময়ূখ' প্রভৃতি ঐতিহাসিক কাহিনী প্রকাশ পেলো; 'ভারতী' দলের সৌরীন্দ্রমোহন, চারুচন্দ্র, মণিলাল চেষ্টা করেছেন নতুন ধরনের গল্প-উপন্যাস সৃষ্টির; বিশ্বযুদ্ধের অস্থিরতা, ভয়াবহতা, নৈরাশ্যবাদ, এসে মানব-মনের গভীরে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিল। পরন্তু ১৯২১ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন, (১৯২০) কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা (১৯২৭) এবং ১৯৩০ সালে লবন আইন আন্দোলন এবং সন্ত্রাস-বাদের অন্তর্লীন বিরাজমানতার সাথে সাহিত্যের বিষয়বস্তু দানা বাঁধতে শুরু করেছে সুন্দরভাবে। শৈলজানন্দের কয়লা কুঠির গল্প, অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে', যুবনাশ্বের 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী', সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্মৃতির আলোয়' এবং পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসুর 'সাড়া' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র মাঝে প্রেমেন্দ্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' ছোটো গল্পটি মানুষের মনের দরজা খুলে দিল। মানুষের প্রতি অসীম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা, মানুষের পূর্ণতম রূপের সংজ্ঞা নির্ধারণ, নিয়ে রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র কালীন রোমান্টিকতা বিদায় ও অন্যদিকে ভাবুকতালেশ মবিডির[৪] পত্তন শুরু হলো যে কাব্যকার ও কথাকারের লেখনীতে তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র। মধ্যবিত্তের নগর-জীবনের পারিপার্শ্বিকতা নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছিলেন: "মানুষ দেবতাও নয়, পশুও নয়। সে সময়ে তাঁর যুগ সচেতন মনে মানুষের অসহায় আকুলজিজ্ঞাসার বেদনাই ধরা পড়েছিল।' ঐ সময়ে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পাঁক' বাংলা সাহিত্যের আলোড়ন এনেছিল। জীবন নিয়ে এই ধরনের উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে প্রথম। 'ইহাতে শহরবাসী বস্তি জীবনের চিত্র, মোটা রঙ দিয়া আঁকা। মানবসমাজের ও মানব জীবনের

এই যে দীনতা-বেদনার পংক ইহা প্রেমেন্দ্র বাবুর মতে—বাহ্য ঘটনার সংঘাত-মাত্র নহে। আদিমতম জীব প্রোটোপ্ল্যাজমের উদ্ভব যে পাঁকের মধ্যে সেই "জননী" পঙ্কের আলেপন প্রোটোপ্ল্যাজমের উত্তর পুরুষেরা আজ অবধি বহন করিয়া আসিতেছে।'[৫]

একদিকে মার্কসীয় অর্থনৈতিক চিন্তা ও রাজনৈতিক চিন্তা, বিজ্ঞানের অবিশ্বাস, ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিটি বিষয় সমীক্ষা, পশ্চিমী জীবনানুভূতি ও যুক্তিবাদিতার পাশে রোম্যান্টিকতা, প্রাচ্য উপনিষদিক ধ্যান-ধারণা, নগর ও যন্ত্রসভ্যতার বিকলাঙ্গ রূপ ১৯১৭-১৮ সাল থেকে ১৯৩০-৩১ সাল পর্যন্ত কবি-সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিকদের মনের ঘরে বাসা বেঁধেছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই সত্তার নকীব। জেমস জয়েসের ইউলিসিস (১৯১৪-২২), ভার্জিনিয়া উলফ্ বা জেমস জয়েসের স্ট্রীম অব্ কনসাসনেস, বার্গসঁর ইলান্ ভিটাল তত্ত্ব, অলডাস্ হাক্সলীর ব্রেভ 'নউ ওয়াল্ড', এলিয়টের দি ওয়েস্ট ল্যান্ড্ প্রকাশিত হলো। বিজ্ঞান আদর্শবাদীদের ভিত্ নাড়িয়ে দিয়ে গেল। আমাদের দেশের ১৯১৯ ১৯২১-এর আন্দোলনের সময়ে হিন্দীতে প্রেমচাঁদের 'প্রেমাশ্রম' উপন্যাস বেরিয়েছিল। "তাতে ভারতবর্ষের কৃষকজীবন, গান্ধীজীর সেবাধর্ম, এবং টলস্টয়ের আদর্শ সবই অল্পবিস্তর প্রতিফলিত হয়েছিল। মনে পড়ে বাংলাতেও এ কালের মনোজ বসু কিংবা বনফুল কিংবা তারাশংকরের একাধিক উপন্যাসে বাংলা-দেশের গ্রাম, কৃষক, জমিদার ইত্যাদির কথা আছে।[৬] এ সবের মাঝে এলো বিজ্ঞান ভিত্তিক মানুষের পূর্ণরূপদাবী। মানুষ শুধুমাত্র রক্ত মাংস গড়া নয়। পূর্ণাঙ্গ মানুষের রূপ বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ গুণগুলির যোগফল। হাক্সলির পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট-এর মার্ক র‍্যামপিয়ন তাই বলেছে, চাই, পুরো এবং খাঁটি মনুষ্যত্ব। খবর কাগজ-পড়ুয়া নয়, নাচগান আর রেডিও-পাগল নয়। শিল্পপতিরা যেসব মাপা আমোদ—বরাদ্দ করেছেন তার ফলে, কাজেও যেমন, অবসরেও তেমনি মানুষ ক্রমশঃ বোকামির যন্তর হয়ে উঠবে। কিন্তু তাদের রুখতে হবে। মানুষ হবার চেষ্টা কর।[৭]

এ যুগে সাহিত্যে বাস্তবতা এল। অবশ্য এ যুগকে কল্লোল যুগ বলা যে যায় না তাও সজনীকান্ত দাস প্রভৃতিরা[৮] প্রমাণ করে দিয়েছেন। যাই-হোক অচিন্ত্যকুমারের মতে ঐ যুগ কল্লোলযুগ। কল্লোল ১৩৩০ সালে বৈশাখে আত্মপ্রকাশ করার পূর্বে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, নজরুল, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এমনকি অপেক্ষাকৃত বয়োকনিষ্ঠ বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে ও কল্লোল-এর দান নন। তাঁরা প্রগতির দান। যাইহোক এই অধ্যায়ে বা যুগে সাহিত্যে বাস্তবতার,

নামে অশ্লীলতা বা যৌনতা বাণীমূর্তি' লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে সজনী-কান্তের বক্তব্য উপেক্ষণীয় নয়।" 'কল্লোল' তখনও উদগ্র হইয়া উঠে নাই, ১৩৩২ সালের শেষ পর্যন্ত তাহার কলধ্বনি কানে বাজিতেছিল। তখন বাংলা সাহিত্যে প্রিমলজির সাইকলজির নামে বিবিধ নূতনত্বের সম্পাদনা করিয়া আসর মাত করিয়া রাখিয়াছিলেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ; সেনগুপ্ত মহাশয়ই প্রধান। নূতন বৎসরের গোড়া হইতে 'জল—কল্লোল' হঠাৎ যৌন কল্লোল হটবার সাধনায় মাতিল। আমি 'Orion' বা কালপুরুষ নামক একটি দীর্ঘ নীহারিকা-নাটক রচনা করিয়া বিরহ-সংখ্যায় শ্রীকেবলরাম গাজনদারের বেনামীতে প্রকাশ করিলাম।[৯]

এখন প্রশ্ন বাস্তবতা সাহিত্যে চিত্রিত হলে তাকে আর্টের জন্য নিন্দনীয় ব্যাপার বলে অভিহিত করা উচিত কিনা। শৈলজা প্রেমেন্দ্র যুবনাশ্ব প্রভৃতিরা তখন সমাজের অমঙ্গলবোধ (Sense of evil) লক্ষ্য করেছিলেন। এবং তাই এই যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে? যখন ডাক এসেছে—যখন বলাকায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নবীন ও সবুজকে আধমরাদের ঘা মেরে বাঁচাবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন—তখনই সমাজের পাপ, তাপ দুঃখ দুর্দশার হুবহু চিত্র তুলে সমাজের নগ্ন দিক দেখাবার সাহিত্যিক প্রয়াস এসেছে। 'লেখকরা ভাবিতেছেন, আমাদের সমাজ-জীবনের আনাচে কানাচে যে পাপ ও অন্যায় নিত্য অভিনীত হইতেছে, তাহাকেই হুবহু চিত্রিত ও প্রতিবিম্বিত করিতে পারিলেই বুঝি বাস্তব সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। সেইজন্যই আর্টের মর্যাদারক্ষা অপেক্ষা পাঠকের কাছে বিবৃত ঘটনাকে রসালো করিয়া তুলিবার চেষ্টাই প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে—লালসার ফেনিলোচ্ছ্বসিত উদ্দাম বিলাস-শালায় নারীমাংস লোলুপদের আমন্ত্রণের ইঙ্গিতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে এবং অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়—বুভুক্ষার বিস্তৃত বিবরণে নব-কামায়ণ বিরচিত হইতেছে।'[১০] এছাড়া অমলহোম পরোক্ষে শৈলজা-প্রেমেন্দ্র প্রমুখ কথা সাহিত্যেকদেরও আক্রমণ করলেন এই বলে যে, তাঁরা কলকারখানার কুলি-মজুরদের জীবনের বাহিরের দিকটা অর্থাৎ পঙ্কিল দিকটা নিয়েই গল্প লিখেছেন, শ্রমিক শ্রেণীর বা বস্তিবাসীর বলিষ্ঠ কোন নৈতিক দিককে তাঁরা মহিমান্বিত করে চিত্রিত করছেন না। কিন্তু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মনে করেন তার বিপরীত। তিনি লিখেছেন, "কল্লোল" বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।"[১১] সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "বাংলা সাহিত্যে একদা কল্লোল যে

বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল এমন এমন এক ধাক্কা আর আমাদের সাহিত্য চেতনায় কোন দিন লাগেনি। সেই বিপ্লবের উত্তরাধিকার যাঁরা বহন করেছেন এবং অনেকে আজও করছেন, তাঁরা কিন্তু কল্লোলের ভূমিকা সম্পর্কে তেমন সজাগ নন। গতানুগতিকতার বাইরে পদক্ষেপ করতে এবং নতুন জীবন-বোধ প্রকাশ করতে গিয়ে যারা বাধা পাচ্ছেন, রচনা প্রকাশ করার প্রচলিত মাধ্যমগুলি তাঁদের জায়গা দিচ্ছে না, ওই ধরনের চিন্তাধারার বাহন এবং প্রচারণ রূপেই কল্লোলের সার্থকতা।"[১২]

এই গতানুগতিকতাকে নষ্ট করে নতুন সমাজ অন্বেষণ, পুরোনো ভগ্ন-প্রায় সমাজের চিত্র তুলে ধরে তার ভেতরের ক্ষত দেখানোর মধ্যে কল্লোল-যুগের সার্থকতা। কবিতায়, উপন্যাসে ও ছোট গল্পে মুটে, মজুর, কুলি খালাসী, শ্রমিক, ব্রাত্য, পতিতাদের, বস্তিবাসীদের আগমন তাই কল্লোলের অবদান। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন "সবচেয়ে তাদের বড় অপরাধ, তারা নাকি সাহিত্যে অভিজাত্য মানে না। মুটে, মজুর কুলি খালাসী, দারিদ্র্য বস্তি ইত্যাদি যে সব অস্বস্তিকর সত্যকে সর্দি বাত স্থূলতা ইত্যাদির মতন অনা বশ্যক অথচ আপাত অপরিহার্য বলে জীবনেই কোনরকমে ক্ষমা করা যায়, সাহিত্যের স্বপ্ন বিলাসের মধ্যেও এই আধুনিকেরা নাকি টেনে আনতে চায়। শুধু তাই! বস্তির অন্তরের জীবনধারাকে তারা প্রায় প্রাসাদের অন্তরালের জীবনধারার মত সমান পঙ্কিল মনে করে। এমনকি তারা মানে যে প্রাসাদপুষ্ট জীবনের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য সময়ে সময়ে বস্তির জীবনকে ছুঁই ছুঁই—করে।

তারা নাকি আবিষ্কার করেছে যে, পাপী পাপ করে না, পাপ করে মানুষ, বা আরো স্পষ্ট করে বললে মানুষের ভগ্নাংশ। মানুষের মনুষ্যত্ব দুনিয়ায় সব পাপের পাওনা অনায়াসে চুকিয়েও দেউলে হয় না। ··

মানুষের একটা দেহ আছে, এই অশ্লীল কিংবদন্তিতে তারা নাকি বিশ্বাস করে এবং তাদের ধারণা নাকি এই যে এই পরম রহস্যময় অপরূপ দেহে অশ্লীল যদি কিছু থাকে তা তাকে অতিরিক্ত আবরণে অস্বাভাবিক প্রাধান্য দেবার প্রবৃত্তি।"[১৩]

এই হোল কল্লোলযুগের আসল রূপ। কবি প্রেমেন্দ্র নিজে লিখেছেন এই যুগ সম্পর্কে। তিনিও বলেন, "আদর্শ নয়, অসামান্য নয়, কি ছিল তবে 'কল্লোল'? ছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, বস্তু ও ভাব জগতের বিশ্বব্যাপী এক ক্ষুব্ধ শূন্যতা থেকে উথলে ওঠা একটা বিদ্রোহী তরঙ্গ, জীবন ও সভ্যতার সব কিছুর জড়ত্ব আর জীর্ণতা। যা পরীক্ষা করার জন্য দুর্বার।[১৪]

এই আদর্শেই প্রেমেন্দ্রের 'পাঁক' প্রথম বস্তিবাসী মুচিদের জীবন কাহিনী প্রতিভাত, তাঁর 'দেবতার জন্ম হোল' কবিতায় দুঃখী মানুষের মর্মবেদনা, আর মোট বারো' গল্পে পশু ও মানুষের জীবন-যাত্রা চিত্রিত। কল্লোলীকরা যেমন অতিবাস্তবতা চেয়েছিলেন—তেমনি ভাববিলাস বা কল্পনাপ্রবনতাও চাইলেন—' নৈরাশ্য ও দুঃখানুভূতি যেমন বাস্তব জীবনবোধ তেমনি রোমান্টিক মনের ভাবুকতা থেকে উৎপন্ন। কল্লোলে বরাবরই অতিবাস্তবতার পাশাপাশি অবাস্তবতার একটা সুর ছিলো, গোকুল নাগের সঙ্গে ছিলেন যুবনাশ্ব। এরই জন্য রিয়ালিজম ও রোমান্টিসিজম্ দুইয়ের স্রোত কল্লোলে দেখতে পাওয়া যায়। আর রোমান্টিক মনের অন্যতম প্রবণতা যে দুঃখবিলাস বা বিষাদাত্মকতা তা থেকে জন্ম নেয় এক প্রকারের 'অসন্তোষ গান'।"[১৫] রবীন্দ্রনাথের বিষাদ-চেতনা যেমন আনন্দ চেতনায় উত্তীর্ণ হওয়ার ধাপ মাত্র, এঁদের বিষাদ চেতনা তেমন নয়। কল্লোলীয়রা জীবন ও জগৎকে বিচিত্রভাবে দেখেছেন এবং সাহিত্যে প্রকাশ করেছেন। সেই কল্লোলীয়দের মধ্যে প্রেমেন্দ্র এক সার্থকনামা সাহিত্যিক যিনি সাহিত্যে রোমান্টিকতা ও রিয়েলিস্টিকতার নবতম রূপ প্রকাশ করেছেন, যিনি যুগের হয়েও যুগোত্তীর্ণ।

॥ গ্রন্থনির্দেশ ॥

১. কল্লোলযুগ / অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। পৃঃ ৯৫-৯৬ (এম. সি. সরকার, ১৩৭২)

২. "আমাদের মধ্যে অবিশ্যি কেউ কেউ বলশেভিজম-এর নামে মেতে উঠেছেন, আর ভাবছেন, রাশ্যার অনুকরণে ভারতের নির্যাতীত, প্রপীড়িত কৃষক ও শ্রমজীবীদের মধ্যে একটা বিপ্লব আনতে পারলেই দেশ উদ্ধার হ'য়ে যাবে।" পৃঃ ৬২ বলশেভিস্ট্ সাহিত্যের ধারা / শ্রীপ্রভু গুহঠাকুরতা / প্রগতি, শ্রাবণ, ১৩৩৪ "আমরা ঘরে বসে নির্ভয়ে চেহভ, তুর্গেনিয়েভ, গর্কী নাড়াচি, কিন্তু রাশ্যাতে এঁদের কারুর বই বাড়িতে খুঁজে পাওয়া গেলে তা'র প্রমাণ নিয়ে টানাটানি।" পৃঃ ৬২ তদেব।

৩. পরিচয় / ত্রৈমাসিক / ১৩৩৯ / সুশোভন সরকার।

৪. বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা / শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / মডার্ন, ১৩৮০

৫. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস / সুকুমার সেন / পৃঃ ২৭১ [৪র্থ খণ্ড] বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা, ১৯৫৮)।

৬ তারাশংকর / হরপ্রসাদ মিত্র / ৬৯ পৃঃ [শতাব্দীগ্রন্থ ভবন, ১৩৬৮]

৭. তদেব। পৃঃ ৬০

৮. সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতা বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র / নেপাল মজুমদার শিক্ষা ও সাহিত্য। মার্চ-এপ্রিল / ১৯৭৬। পৃঃ ২৫

৯. আত্মস্মৃতি ১ম খণ্ড।। পৃঃ ২২৮-২৯। সজনীকান্ত দাস।

১০. অতি আধুনিক কথা সাহিত্য / প্রবাসী / মাঘ ১৩৩৩ / অমলহোম।

১১. কল্লোলযুগ / অচিন্ত্যকুমার ঃ এম. সি. সরকার ১৩৭২, পৃঃ ২৭।

১২. কল্লোল / পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ঃ বেতার জগৎঃ ১-১৫ নভেম্বর, ১৯৭৪

১৩. কল্লোলের কাল / প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ সাহিত্য সংখ্যা, দেশ. ১৩৮১ পৃঃ ৮৬।

১৪. ঐ পৃঃ ৮৬

১৫. কল্লোলের কাল / জীবেন্দ্র সিংহ রায় ঃ কথাশিল্প, ১৯৭৩ পঃ ১৭০।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের রাজনীতি বোধ

"সমবায়ে সুখ আছে আ... আছে শান্তি / যত পারো গড়ো সমবায় সমিতি সুতরাং। / কিন্তু সাম্রাজ্য যে চাই আমার। / তোমার আমার সকলের চাই সাম্রাজ্য। / শুধু সদস্য যে আমরা নই, আমরা যে সম্রাট।"[১]—সমবায়ে 'সুখ ও 'শান্তি' থাকলেও শুধু সদস্যপদে সন্তোষ নেই, সাম্রাজ্য চাই। 'প্রথমা'র কবি মানুষের দারিদ্র্য ও লালসার বীভৎসতা[২] দেখে শিউরে উঠেছিলেন, 'সম্রাট'-এর কবি তাই জানালেন সাম্রাজ্য চাই, কবি সম্রাট হতে চান আর তাহলেই মানুষের মঙ্গল করা সম্ভব হবে। 'প্রথমা'র কবি কামার, কুমোর, ছুতোরের সামিল হতে চেয়েছিলেন, ভালোবাসার জন্য সময় পাননি তিনি, কিন্তু 'সম্রাট'-এ তিনি ঠিক একইভাবে গণতন্ত্রী মানুষ। প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজনীতি না করলেও তাঁর রচনা থেকে তাঁর রাজনীতিবোধ অনুমান করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'সবাই রাজা রাজার-রাজত্বে'র মতো প্রেমেন্দ্রের সম্রাটত্ব প্রতিটি নাগরিকের বিশালত্বই প্রতিষ্ঠা করেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪—১৮), রাশিয়ার বিপ্লব (১৯১৭), তৃতীয় কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল (১৯১৯) তাসখন্দে প্রবাসী ভারতীয়দের কমিউনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা কবির মানসিকতায় অলক্ষ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। যদি ও 'পাঁক'-এর ভূমিকায় কবি বলেছেন, 'বাদ বিসংবাদ তখনও সাহিত্যে এখনকার চেহারায় দেখা দেয়নি।'[৩]

শরৎ-সাহিত্যে পতিতারা দেবী হয়ে উন্নীত কিন্তু বাংলা সাহিত্যে প্রেমেন্দ্রই প্রথম পতিতাদের বাস্তব ও করুণ জীবনালেখ্য জন-সমক্ষে উপস্থাপিত করেছেন। ('বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে / আশ্বিন, 'কল্লোল' ১৩৩১) তিনিই প্রথম বস্তীবাসী মুচিদের জীবন উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাস ('পাঁক') তিনি ১৯১৮ সাল থেকেই লিখতে শুরু করেছেন যদিও ১৯২৬শে (?) প্রকাশিত হয়েছে। তখন অবশ্য বিদেশী সাহিত্য. গোর্কী, টলস্টয়, মার্কস, বাকুনীন ঘরে ঘরে পড়া শুরু হলেও বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব পড়েনি। সেই সময় প্রেমেন্দ্রের উপন্যাসের অশান্ত কর্মকারের মুখের ভাষা নিঃসন্দেহে তাঁর সাম্যবাদী মনটিকে চিহ্নিত

করেছে। অশান্ত বলেছে, ' আমি দেখছি উৎপীড়িত ও উৎপীড়ক, অবিচারী আর যারা অবিচার সয়, এই দুটো দল। এই দুটো দলের মৌখিক সংযোগ থাক বা না থাক নাড়ীর সংযোগ আছে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সেই এক দলকে পায়ের তলে রেখে তাদের রক্ত শুষে নেবার জন্যে ষড়যন্ত্র চলেছে আরেক দলের—কম আর বেশী।'[৪] মার্কসবাদের এই ধারণা তার মানসিকতায় বর্তমান ছিল। এমনকি অন্য একটি উপন্যাসে তিনি জনতার মুখে ভাষা দিয়েছেন, "পুঁজিবাদ ধ্বংস হোক। মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের। আমাদের দাবী মানতে হবে। ইনকিলাব। জিন্দাবাদ।"[৫] যদিও তাঁর কোন উপন্যাসে বা কবিতায় মার্কসীয় চিন্তাধারার সঠিক প্রতিফলন[৬] নেই, তবুও একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে তিনি অসাম্য চান না। মানুষের ন্যায্য অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার তিনি পূর্ণ বিরোধী। তাই এই চিরলাঞ্ছিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন, "মানুষের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যে অন্যায়—শুধু অন্যায় কেন রীতিমত পাপ, সেটা যেন তারা মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী পরধনলোভীদের পাপ চক্রে ভুলতে না বসে।......বিপ্লব আজ ছড়িয়ে পড়েছে, মিশিয়ে গেছে মানুষের রক্তে, যেমন করে—মিশিয়ে থাকে শ্বেত কণিকায় ঝাঁঝ; যাদের আলাদা করে দেখা যায় না, আলাদা করে ধ্বংসও করা যায় না ইচ্ছেমত। তা ছাড়া এই চির-লাঞ্ছিত মানুষের দল, যারা ঘুমিয়েছিল বহুদিন তারা যখন জাগে তখন ভীষণভাবে জাগে, খুব বেলাতে ঘুম ভাঙলে আলোর ঝটকায় চমক খেয়ে ছুটে পালায়, ভীরু ঘুমে যায় নির্বাসনে।"[৭] 'প্রথমা'র যুগেও তিনি বলেছিলেন, 'হে প্রহরী, হানো অসি নিশার মরমে, / যুগ যুগান্তরে এই সঞ্চিত আঁধার কেটে যাক / বেদনার উষ্ণ রক্তধারে; / রক্ত পারাবার হতে উদ্বোধন হোক আজ নূতন উষার।"[৮] তিনি রক্ত পারাবার থেকে নূতন উষার উদ্বোধন কামনা করলেও তিনি মার্কসিস্ট নন। তিনি আদর্শ সমাজ চান এবং সেই জন্যে 'পাঁক'-এ অশান্ত কর্মকার বলেছে, "আদর্শ মানব সমাজের জন্য ব্যাকুলতা মানুষ আজ তো সবে প্রকাশ করেনি। যুগে যুগে দেশে অসংখ্য—রচনায় নানাভাবে এই সমাজের নক্সা আঁকা আছে। কিন্তু আপনি তো জানেন এই আদর্শবাদীদেরই আদর্শের মধ্যেও এত পার্থক্য যে 'ওয়ান ম্যানস্ হেভন ইজ অ্যানাদার ম্যানস্ হেল।' মানুষের এই পার্থক্য, এই বৈচিত্র্যকে সম্মান করে, আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে যে সমন্বয়ে তার রসায়ন কোন একজন মানুষের জানা নেই।"[৯] এবং এই জন্যেই বুঝি তিনি 'মিছিল'-এ গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের সমালোচনা করেছেন অকপটভাবে; 'মগুর না হলে কোন গণতন্ত্রই ভালো করে শেষ পর্যন্ত

চলে না যে শোভান।"[১০] বা "তোরা সব কার্লমার্কস, বাকুনিন, লেনিন পড়িস্, মুখে রাশিয়ার মত পৃথিবীতে সকলকে সব-ধন সমান ভাগ বাটো-য়ারা ক'রে সব সমতল ক'রে দেওয়া উচিত বলিস। আর আমি সোজা মানুষ, তাই শূন্যে হাতেনাতে স্যাকরা বেচারার টাকার পাহাড়ের চূড়োর ডগাটুকু যেই খসিয়েছি অমনি গেলি চটে! লেনিনের দল না হয় মেরেধরে খুন করে হাসিল করেছে; আমার বেলা কি শুধু হাত সাফাই বলেই দোষের হ'য়ে গেল।"[১১]

প্রেমেন্দ্র রক্তপাত চান না, অথচ কী করে আদর্শ সমাজ গড়ে উঠতে পারে তার সমন্বয়ও তাঁর জানা নেই। অন্য একটি শিশু উপন্যাসে তিনি বলেছেন, "পৃথিবীর বর্তমান বিশৃংখলার সুযোগ নিয়ে যদি বিনা রক্তপাতে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যায়। তাহলে তারই চেষ্টা আগে করা উচিত।'...... সাধকেরা কিন্তু এ প্রস্তাবে সম্মত হননি। যদি আন্দোলনের দ্বারা পৃথিবীর চেহারা বদলানো সম্ভব হত তাহলে এত আয়োজন করার দরকার ছিল না। পৃথিবীকে নতুন করে গড়তে হলে রক্তপাত না করে উপায় নেই ...মৃত্যুর ভেতর দিয়েই নূতন জীবন পেতে হবে, এই তাদের সিদ্ধান্ত।...পৃথিবীর নতুন রূপ কে না দেখতে চায়, কিন্তু এই রক্তসমুদ্র ছাড়া তার কি উদ্বোধন হতে পারে না? আর কি অন্য উপায় নেই?"[১২] কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি অথচ তিনি একটি উপন্যাসে বললেন, "গোসমা ও পচাগলা দুনিয়ার সব কিছুর ওপর দুনিয়া পালটে নয়া জমানা আনতে হবে......টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে হবে উপরের ঘেয়ো দুর্গন্ধ বদ-বো চামড়া। সে ছালটা ছাড়িয়ে নিলে যদি নয়া জমানার নতুন তাজা চামড়া বেড়িয়ে আসতে পারে।"[১৩] এই একই মানসিকতায় তিনি 'মনু-দ্বাদশ'[১৪]-এ পৃথিবীর ধ্বংস চেয়েছেন। যাই হোক্, রক্তপাত-রক্তপাতহীনতার বৃত্তে ঘোরপাক খেয়েছেন, এবং এই দোলাচলবৃত্তি তাঁর জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত ছিল।

প্রেমেন্দ্র চান মানুষ, মানুষের সমাজ। তিনি বলেন, "মানুষ গড়তে চেয়েছিলাম আমি— মানুষ তাজা, খাঁটি মানুষ! যেখানে যত মিথ্যে-অন্যায়, অবিচার সব কিছুর বিরুদ্ধে যে বুক ফুলিয়ে রুখে দাঁড়াবে, সব বাঁধন নির্ভয়ে ছিঁড়ে ফেলবে।"[১৫] সবার উপরে মানবই সত্য—।[১৬] তাই তিনি চান নতুন পৃথিবীতে তৈরী হবে, "বাছাই করা মানুষের উপনিবেশ, যাদের প্রতিবেশিত্ব এক নতুন আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যারা মোক্ষের স্বর্গ চান না, যারা মর্তের মানুষ হয়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের এক গভীর ধ্রুব ভিত্তি সন্ধান করে। এমন একটা মর্ত্য কোন যদি গড়া যায়, যেখানে মাটির

কঠিন কোন দাবি মেটাতে আকাশের স্বপ্ন আড়াল হয়ে যায় না।"[১৭] বা "এমন একটা জায়গা তৈরী করতে পারো যেখানে হিংসা নেই, দ্বেষ নেই,— যেখানে মানুষ মানুষকে ভালোবাসে, মানুষ মাথা তুলে তাকাতে ভয় পায় না।"[১৮] এই স্বর্গরাজ্য (Utopian) তৈরীর রসায়নতো প্রেমেন্দ্ররই জানা নেই। তাই তিনি পূর্ণতার আদর্শের জন্যে ধ্যান করছেন। তিনি মনে করেন, পৃথিবীতে অনেক অসাম্য, অর্থের ক্ষমতার, সুযোগের। সে সব অসাম্য দূর করলেই কি সমস্যা মিটে যায়। অসাম্য দূর করবার পরীক্ষা অনেক হয়েছে ও হবে, কিন্তু তার সঙ্গে সব সাম্য যা না হলে বৃথা হয়ে যায়, জীবনের পূর্ণতার সেই আদর্শ খুঁজে যেতে হবে। এ-খোঁজার অবশ্য শেষ নেই। এক পূর্ণতার ধারণা আরেক মহত্তর পূর্ণতায় পেঁছাবার ধাপ মাত্র। তবু সেই খোঁজাই সব।[১৯]

এই খোঁজা চলেছে তাঁর সারা জীবন ধরে। আর এই খোঁজার মধ্যে 'প্রলয় প্লাবন' একান্তই কাম্য। মানুষের মনের গহনেই প্রলয় প্রত্যাশা করেন। তাঁর একটি কবিতায় একথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'প্রলয়ের আগমনী / জানতে মানুষের চোখের দিকে তাকাও' / তোমার পাশে যারা আছে তাদের / নিত্য দুবেলা যাদের দেখছ, তাদেরও। / আকাশ সমুদ্র কি পৃথিবীর বুকে নয়, / কখনো গোচরে কখনো অগোচরে / কালান্তরের ভয়ংকর ভূমিকা / রচিত হচ্ছে মানুষেরই মনের গহনে। / প্রলয়-বিধাতা / তুমি আর আমিই।'[২০] মানুষের কবি মানুষের মধ্যেই মানুষের কল্যাণের উৎস খুঁজে পেতে চান। তাই বলা যায় প্রেমেন্দ্র হিউম্যানিষ্ট।[২১] এমনকি ১৯৭৪ সালে সোভিয়েট দেশে নেহেরু পুরস্কার নিতে গিয়ে তিনি বলেন, "অনাগত ভাবীকালে মানব সমাজের ঊর্ধ্বতন ক্রমবর্ধমান সার্থকতায় পেঁাছে দেবার লক্ষ্য নিয়ে আজকের পৃথিবীতে যারা সবচেয়ে অগ্রসর, তাদের সঙ্গে অচ্ছেদ্য মৈত্রী বন্ধনের নিদর্শনস্বরূপ এ পুরস্কার আমার কাছে এক অক্ষয় অনুপ্রাণনা হয়ে রইল"[২২] তাঁর রাজনীতি বোধ তাই মানবতাবাদের ওপর ভিত্তি করেই গঠিত। মানুষই তাঁর মূলমন্ত্র। এবং সেই জন্যে তিনি শহর-সভ্যতা ও যন্ত্র-সভ্যতার বীভৎস পঙ্কিল রূপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করেছেন আজীবন।

প্রত্যক্ষভাবে তিনি কখনো রাজনীতিতে যোগদান করেননি তবে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ারে বিপ্লবীদের তিনি সমর্থন করতেন। অসহযোগ আন্দোলনে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। যা কিছু ভালো তাকেই সমর্থন জানিয়েছেন, মনেপ্রাণে যা মন্দ বলে বিবেচনা করেছেন, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে যখন ইংরেজী শিক্ষা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আন্দোলন চলছিল, তিনি ইংরেজীর পক্ষে

দাঁড়িয়ে নিজস্ব মত ব্যক্ত করেছিলেন, অথচ কোন রাজনীতিক নেতার পক্ষে যাননি। আসলে তিনি সমস্ত বাদের ঊর্ধ্বে।

তাই তাঁর রাজনীতি বোধ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে তাঁরই একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ উল্লেখ করি ; "ism-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে আমরা 'বাদ' কথাটা ব্যবহার করি, যেমন সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ, ফ্যাসীবাদ ইত্যাদি। সমগ্র জীবনের বিচার বিশ্লেষণ জিজ্ঞাসা যখন কোন রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিই, তখন জীবনের অনেক কিছু সত্যই বাদ পড়ে যায়। অনেক ism-এর উদয় হবে, অনেক ism অস্ত যাবে, কিন্তু পৃথিবীর ঋতুরঙ্গের চির নূতন বিস্ময়, মানুষের হৃদয়ের জটিল রহস্য, জীবনের অন্তহীন জিজ্ঞাসা চিরকালই সাহিত্যকে নব নব প্রেরণা যোগাবে। ism-এর জন্ম যেদিন হয়নি, সেদিনকার বৈদিক ঋষির আনন্দ বিহ্বল কণ্ঠের মন্ত্র অসীম পারাবার পার হয়েও সমান সত্যই থাকবে—আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। / আনন্দং প্রত্যয়ন্ত্য সংবিশন্তীতি।" ('সভাসমিতি' / 'বৃষ্টি এল')

তাই মানবতাবাদী কবির সেই আনন্দরূপ অমৃত-অন্বেষা সারাজীবন ধরে চলেছিল।

।। গ্রন্থনির্দেশ ।।

১. সম্রাট, সম্রাট
২. নমস্কার, প্রথমা
৩. লেখকের নিবেদন, পাঁক
৪ হৃদয় দিয়ে গড়া, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তুলিকলম ১৯৬৯ পৃঃ ১৩৯
৫. কম্যুনিস্টরা তাদের লক্ষ্য বা মত গোপন রাখেন না, খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেন। প্রেমেন্দ্র কখনো 'রক্তপাত'যুক্ত কখনো 'রক্তপাত' হীন বিপ্লব চান। সেইজন্য সূত্রানুযায়ী তিনি কম্যুনিস্ট নন।
৬. "The Communists disdain to conceal their views and aims They openly declare that their ends can be attained by the forciable overthrow of all existing social conditions." Manifesto of the Communist Party. K. Marx and F. Engles.
৭. হৃদয় দিয়ে গড়া, প্রেমেন্দ্র, তুলিকলম ১৯৬৯ পৃঃ ১৩১
৮. দ্বার খোল, প্রথমা
৯. পাঁক, প্রেমেন্দ্র, চতুষ্পর্ণা প্রকাশনী, ১৯৬৭ পৃঃ ১০৫

১০ মিছিল, প্রেমেন্দ্র. বসুমতী সাহিত্যমন্দির পৃঃ ২৭

১১. ঐ

১২ ময়দানবের দ্বীপ, প্রেমেন্দ্র অভ্যুদয় ১৯৬৫ পৃঃ ৯৮-৯৯

১৩ সেই যে শহর রাজোলি, প্রেমেন্দ্র, সুরভী প্রকাশনী ১৯৭২ পৃঃ ৫৬

১৪ মনুদ্বাদশ, এম, সি, সরকার ১৯৭১ পৃঃ ১৪৫-১৪৬

১৫. পতাকা যারে দাও, ঐ ১৯৬৩ পৃঃ ১৫

১৬ 'ময়লা কাগজ' চলচ্চিত্রের প্রথম দৃশ্যের মিছিলের শ্লোগান

১৭. প্রতিধ্বনি ফেরে, আনন্দ ১৯৬৭ পৃঃ ১৫৯

১৮. হৃদয় দিয়ে গড়া, তুলিকলম ১৯৬৯ পৃঃ ১৭

১৯ প্রতিধ্বনি ফেরে, আনন্দ ১৯৬৭ পৃঃ ১৫৯

২০. প্রলয় বিধাতা, ছয় দশকের কবিতা, বইপত্র ১৯৭৭ পৃঃ ৩৬০ এবং 'নদীর নিকটে' কাব্যের 'ছোট মানুষ' দ্রষ্টব্য

২১ আধুনিক বাংলা কাব্যের গতি প্রকৃতি, শুদ্ধসত্ত্ব, বসু, মণ্ডল বুক হাউস পৃঃ ৪৯

২২. সোভিয়েত দেশ ২৩-২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৪

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ক্লাসিক ও রোমান্টিক হৃদয়

কবিতায়, গল্পে উপন্যাসে, শিশু সাহিত্যে শুধু নয় সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় প্রেমেন্দ্র যুক্তিবাদী। সীমিত বক্তব্য, প্রোজ্জ্বল মন্তব্য, বিজ্ঞানী-অনুসন্ধিৎসা শুধুমাত্র শব্দ চয়নে নয়, বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি নবতর রস সৃষ্টিতে তাঁর শিল্পিত সত্তার বিকাশ সুস্পষ্ট।

আসলে কবি প্রেমেন্দ্রের যুক্তিবাদিতা তাঁর বৈজ্ঞানিক মনের দান। একদা ডাক্তার হবার আশা নিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন যিনি, তিনিই আবার সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে সেই বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদিতাই প্রতিষ্ঠা করলেন। উপন্যাস, ছোটগল্প এবং কবিতায়, বিশেষ করে ঘনাদা পর্যায়ের গল্পগুলিতে তাঁর এই বিজ্ঞানী এবং যুক্তিবাদী মনের প্রতিভাস লক্ষ্য করা যায়। এখানেই তিনি ক্লাসিক।

'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' ছোট গল্পে মিত কথনে তিনি এক বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন—ঘরের দরজায় ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িউলীর কর্কশ গলা শোনা গেল, ভর সন্ধ্যেয় দরজা বন্ধ কেন লা বেগুন? খোলনা কতক্ষণ দাঁড়াব? প্রদীপের অস্পষ্ট আলোকে একটি বিগত যৌবনা রোগা লম্বা স্ত্রীলোক সিল্কের একটা শাড়ি সেলাই করছিল—এক, 'স্ত্রীলোকটি রোগা ও লম্বা' শব্দ ব্যবহারে মেয়েটির শারীরিক কুশ্রীতা, দুই, 'বিগত যৌবনা' শব্দে গণিকার সম্বল যৌবন হারিয়ে হৃত সর্বস্ব হওয়া, তিন, 'প্রদীপের অস্পষ্ট আলো'তে দৈন্য, চার, 'সিল্কের একটা শাড়ি সেলাই'—এই শব্দ সম্ভারে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে বারবনিতার সজ্জা সংগ্রহের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। 'দুটি একটি বাক্যে, দুটি চারটি আভাস-ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে 'One climax'-এর আয়োজন প্রায় করে ফেলা হয়েছে, তারপর পরিণামের জন্য অপেক্ষা মাত্র।'[1] প্রখ্যাত সমালোচক বলেন, "শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা সংখ্যায় বেশী নয়। এগুলির গুণ সরল, মিতভাষী এবং স্পষ্ট তাঁহার পদ্যের এবং গদ্যের ইহাই সাধারণ গুণ। অন্তরে ভাবাবেগ যথেষ্ট, কিন্তু তাহা বাক্-বাহুল্যে, অথবা বাষ্পোচ্ছ্বাসে পর্যবসিত নয়[2] এই সংযত ও সংহত বাক্ বিন্যাস যা ক্লাসিক

মনের ধর্ম তা তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে : 'তামাসাটা রেখো মনে / ইলেকট্রনের মরীচিকার এই তামাসা। / রঙীন মেঘের পাড় বুনছে পড়ন্ত রোদ / আর মাটির তরঙ্গে গিয়ে মিশেছে নীল দিগন্তে। / বিধাতা ভাবেন ইলেকট্রনের গণিতে / ছায়াপথ ছাড়ি / অসীম আকাশ জুড়ে / নীহারিকা পুঞ্জে তার অঙ্কের খেলা।' ['তামাসা' / 'সম্রাট']

প্রথম যুগের এই লেখার মধ্যে শুধু নয় সারা জীবন ধরে তাঁর মনের এই গতি লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কূপ খনন এবং তরুবীথি রোপণের উদ্দেশ্য তাই বাস্তবতায় বাঙ্ময়। 'তৃষ্ণার্ত পাবে জল, / পরিশ্রান্ত, পাবে ছায়া, হয়তো ক্ষুন্নিবৃত্তির ফলও।' ['তবু' / 'নদীর নিকটে'] কিন্তু এর পরেও কেন এক 'বহ্নিময় ঘূর্ণি ঝড়' উন্মত্ত হয়ে ওঠে সেই কারণ আবিষ্কার করতে গিয়ে যুক্তিবাদিতার আশ্রয় নিয়েছেন কবি—'কোনো কূপই মানুষের হৃদয়ের মতো / গভীর নয় বলে কি ? / কোনো মহীরুহই মানুষের বিশ্বাসের চেয়ে / নিশ্চিন্ত নিরাপদ নয় বলে ?' ['তবু' / 'নদীর নিকটে']

একটি গল্পের আরম্ভ ও শেষ কত সংযত ও সংহত রূপ নিয়েছে তাও আলোচনাসাপেক্ষ। গল্পটি 'শুধু কেরানী'। শুরু : 'তখন পাখীদের নীড় বাঁধার সময়। চঞ্চল পাখীগুলো খড়ের কুটি, ছেঁড়া পালক, শুকনো ডাল মুখে করে উৎকণ্ঠিত হয়ে ফিরছে।'

শেষ : সব ফুরিয়ে গেল। তখন কাল-বৈশাখীর উন্মত্ত মসীবরণ আকাশে নীড় ভাঙার মহোৎসব।' ['শুধু কেরানী'] এই নীড় বাঁধা ও নীড় ভাঙার মধ্য দিয়ে এক কেরানী দম্পতির জীবনের ঘর বাঁধা ও ঘর ভাঙার সুন্দর উপমা প্রযুক্ত হয়েছে অন্য একটি গল্প 'ভবিষ্যতের ভার'। সেখানে আদর্শ-বাদী শিক্ষক নিজের জীবনে কেমন করে ধীরে ধীরে আদর্শহীন হয়ে যাচ্ছেন তার রূপায়ন লক্ষ্য করা যায় মাত্র একটি বাক্যের মধ্যে। 'ঘুমুচ্ছিলাম… টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে চেয়ারের পিঠে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিলাম।' ['ভবিষ্যতের ভার'] এই বাক্যে ঘণ্টা পড়ার শব্দে চমকে উঠে আদর্শবাদী শিক্ষক আবিষ্কার করলেন যে তিনিও চেয়ারে বসে ঘুমোচ্ছিলেন। শেষ জীবনে লেখা অনেক গল্পের মধ্যে 'যষ্টিরূপে তমোনাশ' গল্পের আরম্ভ অনুধাবন করা যাক : 'তমোনাশবাবু লাঠি হয়ে গেলেন। বেশ মজবুত গাঁটওয়ালা, মাথাটা খোদাই করা আর মটকাটুকু রূপোর লাঠি।' ঐ গল্পের শেষ : 'নেহাৎ মাঝারী সাধারণ মামুলি লাঠিটার সঙ্গে খুব বেশী তফাত কি আমার ছিল ?' [যষ্টিরূপে তমোনাশ]। এই লাঠি উপমায় তমোনাশবাবুর চরিত্র চিত্রিত হলো—বৃদ্ধ বয়সে লুকিয়ে সিনেমা দেখা ছাড়া আর কোন দোষ যার নেই—সেই বৃদ্ধ

সংসারের সব দায়িত্ব নিয়ে লাঠির মতোই অপরিবর্তিত আছেন। লাঠি যেমন বৃদ্ধের ভার বহন করে শুধুমাত্র অবয়বের কিছু চিক্কন রূপ নিয়ে বেঁচে থাকে, বৃদ্ধও সংসারের ভারবাহী লাঠি হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছেন। অবশ্য বার্ধক্যেও যৌন-চিন্তা যে অনেকের মধ্যে নিহিত থাকে সেই বাস্তবতা গল্পে অমর্যাদা পায়নি তাই সে লাঠির মতই জড় পিণ্ডের মতো চিহ্নিত হলো। পরিশীলিত শব্দ বিন্যাসে গল্পটি নিটোল হয়ে উঠেছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পূর্ণ মানুষ চান। তাঁর কবিতায় তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ রূপ নিয়েছে। জগৎ ও জীবনকে একটা নিয়মের মধ্যে স্থিরভাবে প্রত্যক্ষণই ক্লাসিকের ধর্ম। অবশ্য এই প্রত্যক্ষণ যখন ব্যক্তি কল্পনার আলোকে আলোকিত হয়ে পরিমার্জিত রূপ নেয় তখনই তা রোম্যান্টিক। দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা সমান্তরাল ফল্গুধারা বহমান। রোম্যান্টিকতা মানব মনে আন্দোলন আনে, উদ্বেল করে। ক্লাসিকতা আনে সংহত ও সংযত ভাব মাধুর্য। কবি বললেন, মানুষের মুখ চেয়ে যে পৃথিবীর এই অক্লান্ত আবর্তন! / তার অর্থ কি হিংস্র নখরাঘাতে সৃষ্টি বিদারণ করে চলে / রক্ত লোলুপতার অভিযানে?' ['মানে' / 'প্রথমা'] পূর্ণ মানুষের অর্থ চাওয়াইতো বৈজ্ঞানিকতা। সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী বলেছিলেন, 'মানুষকে মুক্তি দেওয়ার চেয়ে বড়ো কথা মানুষকে সম্পূর্ণ করা ; বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে মানুষকে সম্পূর্ণ করা।' ['মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী' / শিবরাম গ্রন্থাবলী]। সুতরাং গোটা মানুষের মানে চাওয়ার মধ্যে তাঁর বিশ্লেষণী মানসিকতা স্পষ্ট সন্দেহ নেই।

'কাঠের সিঁড়ি' [সম্রাট] কবিতায় যেমন 'কাঠের টুল' এবং নিঃসঙ্গ জনতা'র মধ্যে যুক্তিসঙ্গত পার্থক্য প্রতিভাত হয়েছে, তেমনি প্রবন্ধাবলীর মধ্যেও যুক্তিবাদী মন লক্ষণীয়। তিনি বলেন, ' ···স্ফুটনিক কি অ্যাটলাস ডি-তে মহাশূন্য পাড়ি দিয়ে মানুষ হঠাৎ সৃষ্টি ছাড়া যে কিছু করে বসেনি, তার জৈব ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করছে মাত্র, এইটুকু শুধু নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করছি।' [অসংলগ্ন ২ : ১]

এভাবে বিচার করলে তাঁর ক্লাসিক দৃষ্টিভঙ্গির বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে একটি উপন্যাসে। শুরু কত সুন্দর সংহত সংযত ভাষা দিয়ে ; 'প্রথমে মনে হয় সাদা জাজিমের ওপর যেন কালো তিল ছড়ানো।' 'তিল' এখানে 'পোকা' উপমা এবং মানুষকে পোকার মতই এই লুপ্ত উক্তিতে সারা উপন্যাস অনুরণিত : এই 'প্রতিধ্বনি ফেরে' উপন্যাসটি আধুনিক জটিল জীবনের বাস্তবতার অনুরণন। এছাড়া 'মঙ্গল গ্রহে ঘনাদা', 'শুক্রে যারা গিয়েছিল' 'ড্রাগনের নিঃশ্বাস', 'মামাবাবু ফিরেছেন', 'কুহকের

দেশে' ইত্যাদি কিশোর উপন্যাসেও যুক্তিহীন কোনও কথাই উপস্থাপিত করেন নি। 'পাতালে পাঁচ বছর' উপন্যাসের শেষাংশ আলোচিত হলে প্রেমেন্দ্র বুদ্ধি-বৃত্তির প্রশ্নে কতখানি সচেতন তা প্রমাণিত হবে। আমি ভীত হয়ে বললাম, 'পাঁচ বছর ধরে এই সমুদ্রের তলায় থাকতে হবে।' শরৎ একটু হেসে বললে, 'আমাদের বুদ্ধিতে যদি ঘুণ ধরে থাকে আর সাহস যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাই হবে।' ['পাতালে পাঁচ বছর'] অর্থাৎ বুদ্ধি শূন্য হলেই মানুষের অবস্থা করুণ হবে। বুদ্ধি-বৃত্তির ব্যবহার তিনি ঘনাদার প্রতিটি গল্পেই করেছেন। ইতিহাস-ভূগোল বিজ্ঞানের পরিভাষা ও অর্থ ইতস্তত ছড়ানো তাঁর এই পর্বের সব গল্পে। একটি লাটুর গল্প শুরু করে সেই লাট্টুই যে আমেরিকার উড়ন্ত চাকতি [লাটু] যা একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রযান সেটির সম্পর্কে সংহত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। তেলের গল্প করতে গিয়ে তিনি আমেরিকার সমুদ্রের ওপর ভাসমান তেলের ওপর 'পলিএরেথেনে'র কথা জানিয়েছেন—যা পলিকমপ্লেক্স এ জলে-ভাসা তেলের ওপর ছড়ালে তা তেলকে সূক্ষ্ম ভাগে ভাগ করে তার সঙ্গে মিশে গিয়ে জীবাণুদের এমন সুখাদ্য হয়যে আলো হাওয়ায় তেল উবে যেতে দু' মিনিটও সময় লাগে না। ['তেল']। এছাড়া গোয়েন্দা কাহিনীর নানা গল্পেও এমনি কল্পনার রাশ টানা রূপ পাওয়া গেছে। পরাশর বর্মা কবি তার কাজ কর্ম কাব্যিক অথচ অসংযত নয়—অগোছালো নয়—খুব ধীর স্থির ভাবে সে অনুসন্ধানের পথে পা ফেলে চলে। যাঁরা রোমান্টিক নন তাঁদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে অধ্যাপক বাওরা বলেছিলেন যে তাঁরা বিচার করে কল্পনাকে অনুমোদন করেন, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অনুভূতি ও উপমার কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে চিত্রকল্প ব্যবহার করেন, আবেগপ্রবণতাকে সত্যরূপ দেন, সাধারণের অভিজ্ঞতাকে সাধারণভাবেই প্রকাশ করেন, নবনব সৃষ্টিতে আপন দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তার করে না, অপরিচিত ও অদৃশ্যের সন্ধানে যাত্রা করতে চায়, অথচ তাঁরা সৃষ্টি করেন না বরং ব্যাখ্যা করেন। জগতের রহস্য নিয়ে তাঁরা ব্যস্ত নন, তাঁরা ব্যস্ত প্রকাশ করার জন্য : 'They approve of fancy, provided that it is controlled by what they call judgement, and they admire the act of using images, by which they mean little more than visual impressions and metaphors. But for them what matters must in poetry is its truth to the emotions or as they prefer to say sentiment. They wish to speak in general terms for the common experience of man not to indulge personal whims in creating new worlds.

For them the poet is more an interpreter than a creator, more concerned with showing the attractions of what we call already know than with expeditions in to unfamiliar and the unseen. They are less interested in the mysteries of life than in its familiar appearance, and they think that their task is to display this with so much charm and truth as they can command :][৩] এই দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রেমেন্দ্রকে ক্লাসিক বলা চলে। কিন্তু তিনি যে স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টির ভাষ্যকার, অজানা অচেনা জগতের চেয়ে নানা জগতের সঙ্গে বেশী সম্পর্কিত একথাও ঠিক নয়।

…২…

প্রেমেন্দ্র রোম্যান্টিক। তার কবিতার মধ্যে গতিশীলতা আছে। কল্পনার আলোকে, সৌন্দর্যের মধ্যে ভবিষ্যতের এক অব্যক্ত স্পন্দন এবং অনির্দেশ্য অভিব্যক্তির রূপরেখা তৈরী রোম্যান্টিকদের কাজ। সমালোচক বলেন, 'The great Romantics, then agreeed that their task was to find through the imagination some transcendental order which explains the world of appearances and accounts not merely for the existence of visible things but for the effect which they have on us, for the sudden, unpredictable beating of the heart in the presence of beauty, for the conviction that / what then makes us can not be cheat or an illusion, but must derive its authority from the power which moves the universe'.[৪] কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে Trancendental order যেন দেখতে পাচ্ছেন যা আগামী পৃথিবীর শুধু দৃশ্য বস্তুর মধ্যে নয় —সৌন্দর্যের উপস্থিতিতে ভবিষ্যতের হৃদস্পন্দনেও। তাঁর রোম্যান্টিকতায় ইহবাদিতার মধ্যে সেই অনুভূতিটুকুর স্পর্শ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তাঁর যৌবনের একটি কবিতার ক'টি পংক্তি : 'আলোয় তোমায় দেখেছিলুম, অন্ধকারে তুমি অবাধ / হয়ে ধরা দিলে, তোমায় পেলুম' ['নেবাদ্বীপ'/'আমের বোল'] অথবা 'উত্তর মেরু মোরে ডাকে ভাই, দক্ষিণ মেরু টানে / ঝটিকায় মেঘ মোরে কটাক্ষ হানে ; / গৃহ বেষ্টনে বসি, / কখন প্রিয়ার কণ্ঠ বেড়িয়া হেরি পূর্ণিমা শশী।' ['সমুদ্রের আহ্বান' / 'প্রথমা' —এর মধ্যে 'Visible things'-এর মাধ্যমে 'Transcendental' রূপের দিকে তাঁর অভিযাত্রা।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের রোমান্টিকতার আলোচনায় তাঁর প্রেমিক মানসের

অভিব্যক্তির স্থান কম নয়। তিনি ইহবাদী। আজীবন তিনি প্রেমিক। পরপর কয়েকটি কবিতায় তাঁর সেই মানস লক্ষ্য করা যাক।

ক. 'ফাল্গুনেতে যা পেয়েছি তাই / না হয় আমি বিলিয়ে এলাম ভাই / তাই বলে কি তখন বিরাগ ভরে / রইবে বসে অভিমানে ঘরে / ঘরে যাদের প্রেম-মন্দাকিনী / তাদের আবার কিসের অভাব ভাই ?' ['আমের বোল' ২৫]

খ. 'এ বিস্বাদ জীবনের বিষ পাত্রখানি / ওষ্ঠে তুলি ধরি / নিঃশেষিয়া যাব পান করি, / শুধু তার সযতনে অনুরাগ স্মরি / জীবন-শিয়রে বসি দোলা দেয় যে স্বপ্ন সুন্দরি' ['স্বপ্ন দোল' / 'প্রথমা'

গ 'আজ দরজায় / তাইত কবি ডাক দিয়ে যায়— / ফাল্গুন ফুরায়— / আগুন জুড়োয়— / মধু মাসের মহোৎসবে দস্যু হয়ে লুটবি কে আয়। / ছিনিয়ে নেবার সাহস যে চাই / বিনিয়ে কাঁদিস কার ভরসায় ?' ['ইহবাদি' / 'প্রথমা']

ঘ. 'সব আলিঙ্গন এক / নদীর, নারীর। / একই বুঝি এ সত্তার গহন যাচনা— / অভেদ আশ্লেষে / নিঃসর্ত নিজেকে ঢেলে, চেতনায় তবু ধরে রাখা, / স্বতন্ত্রের শশঙ্ক শিহর।' ['হয়তো' / ছয় দশকের কবিতা]

এই প্রতিনিধিমূলক ছত্রগুলিতে তাঁর রোমাণ্টিক মনের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। ঘরে যাদের প্রেম মন্দাকিনী তাদের ঘরে কিসের অভাব। ঠিক এর পরেই 'স্বপ্ন সুন্দরীকে স্মরণ করে জীবনের বিষপাত্র পান করতে তিনি পরোয়া করেন না। অথচ ঐ কাব্যে দৈহিক শক্তিতে প্রেম ভোগ করার বাসনা প্রকাশ করেছেন কিন্তু শেষ প্রকাশিত কাব্যে তিনি নদী ও নারীর আলিঙ্গন ও আশ্লেষ একই পর্য্যায়ভুক্ত করেছেন। ফলে প্রথম উদাহরণে দৃশ্য [মূর্ত], দ্বিতীয়টিতে অদৃশ্য [বিমূর্ত], তৃতীয়টিতে মধুমাসের আয়োজনের মধ্যে প্রেমের অনুপস্থিত দৈহিকরূপ এবং চতুর্থটিতে প্রেমের দার্শনিক অভিব্যক্তি প্রকাশমান। তাই সমকালীন কবিদের সঙ্গে তুলনায় তাঁর বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। বিখ্যাত সমালোচকের ভাষায় বলা যায়; 'কোন রকম প্রথাগত অর্থে তিনি স্বপ্নাঞ্জন লোভী নন। 'ভারতী' দলের স্বপ্ন নয়, মোহিতলালের প্রজ্ঞাপীড়াময় স্বপ্ন নয়, বুদ্ধদেব বসুর বিষাদময় ভাবালুতা নয়, জীবনানন্দের মত প্রাকৃতিক শান্তির স্বপ্নে চিরমগ্নতাও তাঁর স্বভাব নয়; তাঁর স্বপ্নপ্রবণতা বরং কিঞ্চিৎ ওমর খৈয়ামী প্রতিধ্বনির সঙ্গে জড়িত; মোহিতলালের সংগে কিঞ্চিৎ যোগ অনুভব করা যায় এই সূত্রে।'[৫]

বুদ্ধদেব বসুর বিষাদময় রোমাণ্টিকতার মধ্যে দার্শনিকতা এবং অস্পষ্টতার মিশ্রণ অস্বীকার করা যায় না। যেমন, 'সে কেবল বার বার অসীমের

কানে কানে একটি গোপন বাণী কহে—/ 'তবু আমি ভালোবাসি, তবু আমি ভালোবাসি আজি !' / রক্তমাঝে মধ্যফেনা, সেথা মীনকেতনের উড়িছে কেতন, / শিরায় শিরায় শত সরীসৃপ তোলে শিহরণ, / লোলুপ লালসা করে অন্যমনে রসনা লেহন / তবু আমি অমৃতাভিলাসী ! / অমৃতের অন্বেষণে ভালবাসি, শুধু ভালবাসি, / ভালবাসি আর কিছু নয়। / তুমি যারে সৃজিয়াছ, ওগো শিল্পী, সে তো নাই আমি, / সে তোমার দুঃস্বপ্ন দারুণ। বিশ্বের মাধুর্য রস তিলে তিলে করিয়া চয়ন / আমারে রচেছি আমি ;—তুমি কোথাছিলে অচেতন / সে মহাসৃজনকালে— তুমি শুধু জানো সেই কথা।' ['বন্দীর বন্দনা'] এর পাশে জীবনানন্দের 'তোমার শরীর— / তাই নিয়ে এসেছিল একবার ; তারপর, মানুষের ভিড়, / রাত্রি / আর দিন / তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্ দিকে জানিনি তা, হয়েছে মলিন / চক্ষু এই ; …কত দেহ এল গেল, হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে / দিয়েছি ফিরায়ে সব : সমুদ্রের জলে দেহ ধুয়ে / নক্ষত্রের তলে / বসে আছি : সমুদ্রের জলে / দেহ ধুয়ে নিয়া / কি আসিবে কাছে প্রিয়……' ['ধূসর পাণ্ডুলিপি'] বা 'হেমন্তের রৌদ্রের মতন / ফসলের স্তন / আঙ্গুলে নিঙাড়ি / এক ক্ষেত, ছাড়ি / অন্য ক্ষেতে চলিব কি ভেসে / এক সবুজ দেশে' ['পিপাসার গান' / 'ধূসর পাণ্ডুলিপি']।

জীবনানন্দের রোম্যান্টিক নস্টালজিয়ার মধ্যে অবগাহন স্নান প্রেমেন্দ্র করেন না। তাঁর রোম্যান্টিকতার মধ্যে নস্টালজিয়ার সঙ্গে রিয়েলিস্টিকতার সুর কখনো, কখনো বা আত্মভাবগত অতিদৈহিকতার নিবিড়তা।

তাই তাঁর প্রথম জীবনের কবিতায় : 'তুমি আমার আকাশ / আমার দুরন্ত স্রোতে কম্পমান / তোমার পরিচয় ! / তুমি আমার অরণ্য ! / আমার ঝঞ্ঝা বেগের প্রশ্রয় ও প্রতিবিম্ব।' ['ঝড় যেমন জানে অরণ্যকে' / 'সম্রাট'] এবং শেষ জীবনের কবিতায় : 'এ পৃথিবী প্রেম নয়, বিমুগ্ধ বিস্ময় : / নয় আর বুক চেরা রক্তাক্ত জিজ্ঞাসা। / শুধু রুগ্ন কৌতুহল, / স্পন্দহীন চেতনায় সাড় তোলা / মাদকের নেশা।' ['নিরালা' / 'নদীর নিকটে] অথবা 'চিল না হতে পারি, এসব ছাড়িয়ে ছাদে ছাদে উদ্দাম ছেলেগুলোর / ঘুড়ি ওড়ানোর মত / নীলাকাশের সেই সোনালী উৎসবে / যদি নিজেকে ভাসাতে পারতাম নিরুদ্বেগে।' ['রোদ' / 'নদীর নিকটে']।

তাই এখানেও ওমর খৈয়ামের সঙ্গে তুলনা খাটে না। 'প্রথমা' কাব্যে বা তার পূর্বে লেখা [পরে প্রকাশিত] 'আমের বোল' কাব্যে দৈহিকতা অতি-দৈহিকতায় রূপান্তরিত। এই কাব্যে অন্য একটি ক্ষেত্রে প্রেমের মধ্যে নিরা-ভরণা অতৃপ্তি অনুভব করেছেন কবি। যেমন, 'শ্রাবণের মালিনীর চোখের জলের অশ্রান্ত / প্রবাহের ধমকে তার চাউনি আকাশময় চমকে উঠেছিল /

সেই চমকানিতে তাকে দেখেছিলুম / তোমার কলঙ্কিনী প্রিয়াকে। তার আভরণ নেই অঙ্গে,…'আজ ঘরে বসে আমার কেন কেবলি মনে হচ্ছে সে বুঝি আমার বুকের অবোধ বাসনা এই আমরা নিরাভরণা অতৃপ্তি।'

প্রেমেন্দ্রর সঙ্গে ওমর খৈয়ামের রোম্যান্টিকতা তুলনা করলে একটা স্বাতন্ত্য ধরা পড়ে। প্রেমেন্দ্র লিখলেন, 'রূপের মেয়াদ দু'দিন মোটে— / দু'দিন মেয়াদ যৌবনের ; / প্রিয়ার ঠোঁটের গুলবাগে ভাই— / ইজারা যে দুই 'দিনের' ['ইহবাদি' / প্রথমা] এর পাশে নজরুল কৃত খৈয়ামের অনুবাদে দেখি : 'রূপমাধুরীর মায়ায় তোমার য'দিন পার, লো প্রিয়া, / তোমার প্রেমিক বধুর ব্যথা হরণ করো প্রেম দিয়া ! / রূপ লাবণির সম্ভার এই রইবে না চিরকাল, / ফিরবে না আর তোমার কাছে যায় যদি বিদায় নিয়া' কিন্তু যখন প্রেমেন্দ্র বলেন, 'মধুমাসের মহোৎসবে দস্যু হয়ে লুটবি কে আয়। / ছিনিয়ে নেবার সাহস যে চাই— / বিনিয়ে কাঁদিস কার ভরসায় ?'. ['ইহ বাদি 'প্রথমা'] তখন খৈয়াম এর খৈয়াম ! তোর দিন দুয়েকের এই যে দেহের শামিয়ানা / আত্মা নামক শাহনশাহের হেথায় ক্ষণিক আস্তানা।'—প্রেমেন্দ্রকে স্বতন্ত্র করে দেয়। যখন প্রেমেন্দ্র বলেন, 'মনে করি ভালবাসা / শপথ করি এ জীবন হবে প্রেমের তপস্যা ! / প্রভাতের আলোকে চোখ থেকে বুকে নিমন্ত্রণ করি।' ['সংশয়' / 'প্রথমা'] তখন মনে হয় তাঁর প্রেম শুধুমাত্র নারীর সঙ্গে নয়, সূর্যের আলোকের সঙ্গেও

দূরচারিতা রোম্যান্টিকতার চিহ্নও বটে। রবীন্দ্রনাথের 'হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনখানে' যেমন দেখেছি তেমনি দেখেছি প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যে সুদূরের আহ্বান। 'নিশ্চিত থেকে অনিশ্চিত নীড় হ'তে আকাশে / তার অশেষ অভিযান / এই পথ জীবনকে মুক্তি দেয়—অসমাপ্তির অসীমতায়। / এই পথে জীবনের বন্ধনের ছন্দ / এইপথে জীবনের মুক্তির আনন্দ।' ['রাস্তা' / 'প্রথমা']।

সমস্ত শিল্পী কবি সাহিত্যিকেরই কর্মজগৎ থেকে মুক্তি বাসনাই নয় এর চেয়ে গভীরতর কোন রহস্যময় উপলব্ধি তাঁদের কল্পিত জগতের কাম্য হয়। "The poets were conscious of wonderful capacity to create imaginary worlds and they could not believe that this was idle or false. On the contrary they thought that to curb it was to deny something vitally necessary to their whole being"[৬] এই রহস্যময় জগতে ডুব দিতে প্রেমেন্দ্রও চেয়েছেন 'এই রচনায় / তারপর তোমাকেও কখন ছাড়িয়ে / দ্বিজ হই—তপোবলে / অন্তহীন রহস্য সত্তায়।' ['দ্বিজ' / 'হরিণ-চিতা-চিল'] শুধু কবিতায় নয়

প্রবন্ধের মধ্যেও সেই অনুভব পরিস্ফুট। 'যান্ত্রিক শৃঙ্খলা দিয়ে মুড়ে আমরা পৃথিবীকে আসলে না হলেও বাইরের চেহারায় অত্যন্ত নিরাপদ এক-ঘেয়ে ও সাধারণ করে তুলেছি। রোমাঞ্চ কাহিনী যত অপটুভাবেই হোক, সেই সাধারণত্বের পর্দা সরিয়ে পৃথিবীর অন্তহীন রহস্য ঘোষণাই বারবার ঘোষণা করতে হয়।' ['সাহিত্যে রোমাঞ্চ' / বৃষ্টি এল]

প্রেমেন্দ্রের রোম্যান্টিকতায় যেমন আছে দৈহিক প্রেম যা গোবিন্দ দাসকে স্মরণ করায় তেমনি আছে অতিদৈহিক প্রেমও। আছে বাস্তবতা-অবাস্তবতার মাঝে এক রহস্যময় জগতের সন্ধান, আছে দূরচারিতার সাথে জগতকে-জীবনকে ভালবাসার অভিব্যক্তি। সবশেষে বলা যায়, কবি মনে করেন, যন্ত্রণাই সব সৃষ্টির মূলে। সেই যন্ত্রণাকে আমরা Romantic Pain আখ্যা দিতে পারি যা তিনি প্রথমা কাব্যে অনুভব করেছেন। 'শুধু তার সকরুণ প্রেমটিরে স্মরি' ['স্বপ্ন দোল' / 'প্রথমা'] বা 'তারার ছুঁচে সেলাই করে রাত্রি জুড়ে টাঙায় / কার সে ছায়া কার ? প্রাণেশ্বরী পরমা যন্ত্রণার।' ['মুখ' / 'অথবা কিন্নর'] সেই প্রাণেশ্বরী পরমা যন্ত্রণা বা তাঁর প্রেমিকার যে সকরুণ স্মৃতি স্মরণ করার কথা বলেছেন তাতে বিমূর্ত প্রতিমাই আঁকা হয়েছে। আর তাঁর এই নির্বিশেষ প্রেমও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আসলে তিনি ভালোবাসার চোখ দিয়ে জগতের সব কিছুকেই লক্ষ্য করেছেন। তাই তিনি ভাষাবিন্যাসে আবেগ বর্জিত একটি ক্লাসিক গঠনভঙ্গি— গ্রহণ করলেও মনের জগতে তিনি রোম্যান্টিকতা তাঁর ছোট গল্প, উপন্যাস এবং অন্যান্য সাহিত্যকৃতিতে বিশালভাবে ছড়িয়ে আছে।

॥ গ্রন্থনির্দেশ ॥

১. সাহিত্যে ছোট গল্প : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : ডি. এম. লাইব্রেরী

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৪র্থ খণ্ড : সুকুমার সেন, বর্ধমান সাহিত্য সভা ১৯৫৮, পৃঃ ২৭০

3. The Romantic Imagination : M. Bowra. Oxford Paper Backs 1996 page 22

৪. ঐ

৫. বিচিত্রকথা কবিতার : হরপ্রসাদ মিত্র : কথামালা প্রকাশনী ১৯৫৭ পৃঃ ৩৭৭

6. The Romantic Imagination : Bowra, page 1-2

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যে ভৌগোলিক মানচিত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছয় দশকের বেশী কবি জীবনে অসংখ্য কবিতায় যেমন স্বদেশের ভৌগোলিক রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি বিদেশের বিচিত্র ছবিও প্রতিভাত করেছেন। যৌবনে তিনি ছিলেন রোম্যান্টিক অবশ্য তাঁর সেই রোম্যান্টিসিজমকে রোম্যান্টিক রিয়েলিজম বলাই উচিত। তাছলেও সেই রোম্যান্টিকতায় ছিল নিরুদ্দেশের নেশা। জল-স্থল-অন্তরীক্ষ সর্বত্র সমান ভাবে বিহার করার মানসিকতা তাঁর ছিল, এবং সেই সূত্রে পৃথিবীর সর্বত্র তিনি দৈহিক ভাবে উপস্থিত হতে না পারলেও, গ্রন্থের বহু বিস্তৃত জগতে তাঁর বিহার। তিনি কল্লোল যুগের একজন বহু বিখ্যাত পাঠকও বটেন। বিজ্ঞান ইতিহাস, ভুগোল প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর বিচিত্র দক্ষতা তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে বহু অজানা-জগতের বুকে। অবশ্য তৃতীয় বিশ্ব কবিতা উৎসব (১৯৫৭) উপলক্ষ্যে লিডার অব ডেলিগেশন হিসেবে ইটালি, রোম, বেলজিয়াম, ইংল্যান্ড যেমন গেছেন, তেমনি গেছেন আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে মার্কিন সরকারের লিডার্স গ্রান্ট-এ। আবার ১৯৭৬ সালে সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কার পেয়ে রাশিয়াও যান। কিন্তু এসব অনেক পরের কথা। তাঁর স্কুল জীবন থেকে কবিতা রচনা শুরু এবং পর পর অনেক কাব্যে তাঁর ভৌগোলিক পরিক্রমার খবর মেলে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র বিজ্ঞানকে ছোটবেলা থেকেই ভালবাসতেন। এবং সেই ভালবাসার তাগিদে স্কুল জীবনে তাঁর জুলভার্নের সায়েন্স ফিকসান পড়ার প্রেরণা। আর সেই সূত্রে তিনি নিজেও সায়েন্স ফিকসান রচনা করেছেন, যেখানে ঘনাদাকে তিনি বিভিন্ন গ্রহে-গ্রহান্তরে যেমন পাঠিয়েছেন তেমনি ঘনশ্যাম দাস ওরফে ঘনাদা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এমনকি দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতেও যাত্রা করেছে। তাঁর 'শুক্রে যারা গেল', 'মঙ্গল গ্রহে ঘনাদা' বা 'সূর্য্য কাঁদলে সোনা' উপন্যাসে সেই অনুরণন পাওয়া যায়। একদিন তিনি জানিয়েছিলেন, পৃথিবী বিশাল তারা জানিয়াছে, আকাশের সীমা নাই, / ঘরের দেওয়াল তাই ফেটে চৌচির। / প্রভঞ্জনের বিবাগী মনের

দোলা লেগে নাচে ভাই, /তাদের হৃদয় সমুদ্র অস্থির।' ['সুন্দরের আহ্বান' /'প্রথমা'] অর্থাৎ জীবনানন্দের 'নাবিক' ['ঝরাপালক'] যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাবিকমনও তেমনি নিরুদ্দেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন। কুল নেই, কিনারা নেই—অবিরাম অবিরত বয়ে যাওয়া—অর্থাৎ গতিশীলতার মধ্যে কবির Being তো Becoming-কে পরিণত হওয়াই কাম্য এবং সেইজন্য তাঁর থেমে দাঁড়াবার সময় নেই।

কবিতার মাধ্যমে কবি প্রেমেন্দ্র যে দূরচারী স্বভাবের সে নিয়ে বুদ্ধদেব বসু এককালে মন্তব্য করেছিলেন, অবশ্য সে মন্তব্যের সবটাই বাস্তবানুগ নয়। মন্তব্যটি 'Premendra likes open air and adventure, and is really more interested in travel and exploration than in the problems of Social exploitation. Fascinated by the far away, he not only conjures romance from geographical names, but Sometimes discovers poetry in geography [An acre of green grass, Ed. 1948, Page 48 Orient Longman] বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যের সারসত্য তিনি গ্রন্থরাজির মধ্যে দেশ বিদেশের মানচিত্র খুঁজে পেয়েছেন কখনো কখনো তিনি এই ভূগোলের মধ্যে কবিতার ঘর ও ঘরাণা রচনা করেছেন। তিনি নাকি যতটা ভ্রমণ ও আবিষ্কারের জন্য উৎসুক ততটা সামাজিক অবিচারের জন্য : প্রসঙ্গ অত্যন্ত বিতর্কিত। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'পাঁক' বাংলা সাহিত্যের প্রথম গণ-সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার দাবী রাখে। একজন মুচীর জীবনী, যেখানে সামান্য শ্রমিক মালিকের কাছে নির্যাতীত হচ্ছে তার চিত্রবিন্যাস উপন্যাসের মৌল বিষয় অথচ সেখানে Social exploitation চিত্রিত করতে তিনি উৎসুক নন একথা বলা আদৌ যুক্তিসংগত নয়। তাছাড়া 'উপনয়ন', 'মিছিল', 'মৌসুমী', 'আগামী-কাল', 'সেই যে শহর রাজেশালি' প্রভৃতি উপন্যাসে সে প্রমাণ মেলে। কবিতার ক্ষেত্রে তো 'প্রথমা'র যুগেই তিনি বেনামীবন্দর কবিতায় প্রতীকী চিত্র উপস্থাপিত করে নির্যাতীত মানুষের সপক্ষে কলম ধরেছিলেন 'মহাসাগরের নামহীন কূলে / হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই, / জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভিড়। /মালবয়ে বয়ে ঘাল হ'ল যারা / আর যাহাদের মাস্তুল চৌচির। আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল / বুকের আগুনে ভাই' / সব জাহাজের সেই আশ্রয় নীড়'—এছাড়া 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' ['প্রথমা'] কবিতায় অভিশপ্ত মানুষের প্রতি সমবেদনায় তিনি কেঁদে উঠেছেন : 'আজ / বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে, / কাঁদে কোটি মার কোলে অন্নহীন ভগবান মোর ; / আর কাঁদে পাতকীর বুকে / ভগবান প্রেমের কাঙাল,

ইত্যাদি 'ফেরারী ফৌজে'র 'ফ্যান'ও একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা এ প্রসঙ্গে। এছাড়া আরো অনেক কবিতা আছে, সেকথা এখন থাক।

প্রেমেন্দ্র মিত্র যে কবিতার মধ্যে দেশবিদেশের ভৌগোলিক মানচিত্র এঁকেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। তাঁর বিশাল পড়াশোনা এবং দীর্ঘদিন চিত্র জগতের সঙ্গে সংশ্লেষ তাঁকে এ বিষয়ে যথেষ্টভাবে সাজিয়ে তুলেছে। তাঁর অভিযাত্রাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—এক—জল। দুই—স্থল। তিন—অন্তরীক্ষ। জীবনের প্রথম থেকেই তাঁর কবিতার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সাগর, জল, নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি চিত্রকল্প এসে ভিড় জমিয়েছে যা নাবিক মনোবৃত্তির পরিচায়ক। আর সেই জন্যেই রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র 'আর কত দূরে নিয়ে যাবে হে সুন্দরী' ইত্যাদির পাশে প্রেমেন্দ্রের 'নৌকা মোদের নোঙর জানেনা, / শুধু চলে স্রোতে ভাসি— / কেন যে বুঝিতে চাহিনা হেতু ['সুদূরের আহ্বান' / 'প্রথমা'] কবিতার পংক্তিগুলি মনে বড় দাগ কাটে।

'প্রথমা'র যুগে কবি মানুষের অভিযান দেখেছেন মহাকাশের মধ্যে। জীবনের যাত্রা হেরি মহাকাশ ব্যেপে / তারায় তারায় তার জয়ধ্বনি উঠে কেঁপে কেঁপে।' ['মৃত্যুরে কে মনে রাখে'] তাছাড়া মানবজীবনের চলমানতা তাঁর দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে নটরাজের নৃত্য-চপল ভূমিকা নিয়ে। সেখানে আফ্রিকার সাহারার ভয়ঙ্কর রুক্ষতার সঙ্গে মানুষের জীবনের রুক্ষতার তুলনাও করেছেন তিনি, জীবন মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস্, শুনিস্ কিরে কানে? / মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে। / বৎসহারা কোন্ সাহারা হাহা করে, কোথায় হাহা করে।' পরাবৃত্তি [chiasmas] অলংকার আরোপ করে সাহারার শূন্যতার একটি পরিপূর্ণ প্রতিমা অংকন করতে কবি সমর্থ হয়েছেন।

পরবর্তী কাব্য 'সম্রাট'। এই কাব্যে কবির অভিযান তিনটি দিকেই। জল-স্থল-অন্তরীক্ষ সর্বত্রেই তাঁর সমান গতি। এই কাব্যে কবির ভূগোল—চেতনার পূর্ণায়িত রূপ প্রতিভাত। তিনি পথের পথিক হওয়ার মানসিকতা পোষণ করেছেন! অবশ্য যে 'পথ' কবিকে আকর্ষণ করে সেগুলির প্রতিটিতে ভয়হীন একটা শান্তির আরাম ও বিস্ময়ের ঢেউ মেলে। কবির স্বপ্ন 'সে পথের / অস্তাচল উত্তীর্ণ হয়ে আগামী কালের পানে; স্বপ্ন যেখানে নির্ভীক, / বৃদ্ধের চোখে শিশুর বিস্ময়, / পৃথিবীতে উদ্দাম দুরন্ত শান্তি।' ['পথ'] কবি প্রথমেই বলেছেন, 'সেইসব হারানো পথ আমাকে টানে; কেরমানের নোনামরুর ওপর দিয়ে, / খোরাসান থেকে বাদকশান; / শ্রান্ত উটের পায়ে পায়ে, যেখানে উড়েছে মরুর বালি, / চমরীর খুরে লেগেছে বরফ-গলা কাদা।

['পথ'] এই মরুভূমির ওপর চলার তৃষ্ণা রবীন্দ্রনাথের 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন / চরণতলে বিশালমরু দিগন্তে বিলীন।' কথাগুলিকে স্মরণ করিয়ে মরু-প্রীতি জানিয়ে দেয়। এবং এই মরুভূমির শূন্যতামাখা ঘুমে আচ্ছন্ন কত নগরীর কথা আজ কবির মনে আসছে যেহেতু আজ চোখে ঘুম নেই— । কবির বক্তব্য 'পৃথিবীর স্তরে স্তরে কত ঘুম অগাধ গভীর, / সুমের, মেক্সিকস্, উর, নিনেভ, ওকির, / মরুর বালুকা লুপ্ত গাঢ় ঘুম / কত নগরীর, / অন্ধকারে আজো তার ঢেই।' ['বিনিদ্র']। মাঠের শস্য ঘরে এলে কবি তার জন্য প্রশস্তি গেয়েছেন। এ প্রশস্তি শুধু প্রাচ্যে নয় পাশ্চাত্যেও। কবি তাই জানালেন, 'মানুষ আরেকবার মৃত্তিকাকে দোহন করলে, / পূর্বে ও পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে / ভারতে—ফ্রান্সে—নীলনদীর কানাডায় ; / মৃত্তিকাকে মানুষ অর্ঘ্য দিলে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের মাটিতে সাধ্যমত মানুষকে শস্য দান করে তার রূপটি কবি নিপুণ লেখনীতে তুলে ধরেছেন—মাতা, কৃষাণ, আর সলজ্জ প্রিয়ার বাক্—প্রতিমায়। কবি বললেন, কেউ দিলে মমতার মত আপনা হ'তে / কেউ অনিচ্ছায় কৃপণের মত দিলে মানুষের পীড়নে, / সলজ্জ প্রিয়ার মত কেউ নিজেকে গোপন রেখে-ছিলে / এতটুকু ইঙ্গিতের অপেক্ষায়। তবু সব মৃত্তিকাই দান করলে / মরু প্রান্তের নির্মম বালুকাভূমি আর উচ্ছ্বসিত সুধা / নদীকূলভূমি, / গিরি-বেষ্টিত উপত্যকা আর / সমতল প্রান্তর, / কালো ও রাঙা মাটি, / কঠিন ও কোমল, / যুবতী ও বৃদ্ধা।' ['শস্য-প্রশস্তি']।

কবি দেখেছেন, সুনীল উৎসবের দিনে 'স্টেপি'র দিগন্তের দুপাশে তুষারের মাঝে ফুলের বিস্তীর্ণ বাগান। তাই কবি বলেন, 'শীতল শূন্যতা হ'তে / উল্কা আসে পৃথিবীর / নিষ্করুণ নিঃশ্বাসে জ্বলিতে / 'স্টেপি'র দিগন্তে দেখি / আগুপিছু তুষারের / মাঝখানে ফুলের প্লাবন ['নীলদিন'] 'স্টেপি' অর্থাৎ স্টেপ এশিয়ার বিখ্যাত তৃণভূমি—অবশ্য এই সীমাহীন স্টেপি কোন শাসন জানেনা—মানুষ যখন মানুষের সাম্রাজ্যের সম্রাট হতে চায়—তা সমবায়ের ভিত্তিতেই ঃ সমিতির শাসন মানেনা সে সীমাহীন স্টেপি / বশ মানে না তার বন্য ঘোড়া' ['সম্রাট' / 'সম্রাট']। এই কাব্যের শেষ কবিতায় কবি দক্ষিণ গোলার্ধের কতকগুলি দ্বীপবাসী দ্বীপবাসিনীর কথা বলতে গিয়ে শেষ আফ্রিকার কথাই বলতে পেরেছেন। তারা আজ নীলকণ্ঠ। 'হাওয়াই দ্বীপে যাইনি, দক্ষিণ সমুদ্রের কোন দ্বীপপুঞ্জ / তবু চিনি ঘাসের ঘাগরাপরা ছায়াবরণ তার সুন্দরীদের / ...মোহিনী পলিনেশিয়া। / মহাসাগরে ছড়ান / ভেঙে-যাওয়া ভুলে-যাওয়া কোন্ সুদূর-সভ্যতার নাকি ভগ্নাংশ।' আবার এই পলিনেশিয়ার জন্মরহস্য নিপুণ সুন্দরতায় তাঁর কাব্যে চিহ্নিত ; 'আমি

জানি, / সমুদ্রের ঔরসে / প্রবাল দ্বীপের গর্ভে তার জন্ম।' ['নীলকণ্ঠ'] আফ্রিকাবাসীরা সত্যিই নীলকণ্ঠ। মহাদেব সমুদ্রমন্থনের সময় গরল পান করে পৃথিবীকে রক্ষা করেছিলেন আর এখানে আফ্রিকীয় সভ্যতার ধারক বাহক এঁরা সভ্যতার গরল পান করে নীলকণ্ঠ হচ্ছেন। অথচ এঁরাই অবহেলিত। এই 'নীলকণ্ঠ' প্রতিমাটি সভ্যতার অন্ধকার রূপটির করুণতম রূপায়ণ। দাসপ্রথা, শোষণ, ও নির্যাতনকে কণ্ঠে ধারণ করে আফ্রিকা আজও নীলকণ্ঠ তার পরিচয় দিচ্ছে।

কবির ভৌগোলিক চেতনার সারাৎসার ফুটে উঠেছে স্বদেশ প্রেমে। বঙ্গদেশের সীমারেখায় ঘেরা দেশের মূল্য এবং মূল ধরা পড়েছে এভাবে; 'হিমালয় নাম মাত্র, / আমাদের সমুদ্র কোথায়? / টিমটিম করে শুধু থেকে দুটি বন্দরের বাড়ী, / সমুদ্রের দুঃসাহসী জাহাজ ভেড়ে না সেথা। / গ্রাম লিপ্ত করুণ স্মৃতি। ['ভৌগোলিক' 'ফেরারী ফৌজ'], এই সকরুণ স্মৃতির পাশে সীমায়িত বঙ্গদেশের ছবি: 'আমাদের সীমা হোল / দক্ষিণে সুন্দরবন / উত্তরে টেরাই।' [ঐ]

কবির অন্তরে নতুন প্রভাতের আগমনবার্তা সূচিত হচ্ছে। সমাজের অন্ধকার দূর করতে হলে সূর্যসেনা প্রয়োজন। তাই কবি জানিয়েছেন 'নীলনদী তট থেকে সিন্ধু-উপত্যকা, সুমেরু, আঙ্কাড আর গাঢ় পীত হোয়াংহোর তীরে, / বারবার নানা শতাব্দীর / আকাশ উঠেছে জ্বলে ঝলসিত যাদের উষ্ণীষে, / সেই সব সেনাদের / চিনি, আমি চিনি, / সূর্যসেনা তার / রাত্রির সাম্রাজ্যে আজো / সন্তর্পণে ফিরিছে ফেরারী' ['ফেরারী ফৌজ' / 'ফেরারী ফৌজ']।

আবার কখনো ভৌগোলিক স্থান ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লেষ ঘটিয়েছে, যেখানে সাধারণ মানুষের ছবি পরিলক্ষিত হয়। শ্রাবস্তীর জেতবনে / সুগতের মহাউপস্থানে / সেও বুঝি কোনদিন দূরে হতে করেছে প্রণাম, গ্যালিলিওর হ্রদের কিনারে / শুনেছে সুসমাচার বিস্মিত বিহ্বল; / বাস্তিলের চূর্ণ ভিত্তিমূলে / তারও বুঝি আছে পদাঘাত ..তারপরে সীমাহীন 'স্টেপি'র তুষারে / দিগ্বিজয়ী সম্রাটের সুর্যাস্ত সঙ্কেত / এঁকে দিয়ে গেছে নিজ হৃদয় শোণিতে . 'জনৈক' / 'ফেরারী ফৌজ'] ইত্যাদি।

'গ্রামান্তে রাত্রি'র ছবি আঁকতে গিয়ে কবি নিবিড় অন্ধকারের মহামৌনীরূপ তুলে ধরে বলেছেন: 'নিশ্ছিদ্র রাত্রির বিরাট মসিকৃষ্ণ যবনিকায় যেন / ইতিহাসের সমস্ত অসংলগ্ন দুঃস্বপ্নের ইঙ্গিত। / সুপ্ত আর্যাবর্তের শিয়রে ...গিরিপথে / হিংস্র হূণবন্যা এলো ঝাঁপিয়ে / মিশরের মরুভূমিতে বেজে উঠলো বর্বর বাহিনীর দামামা। ['গ্রামান্তে রাত্রি']

স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল চিত্ত কবির কাছে সুখ প্রেম, শান্তি, আর সত্যের জন্য পিপাসার প্রয়োজন নেই—আজ কবি 'আত্মায় ধর্ষিত... / আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত সত্তায় / অশুচি স্পর্শের ক্ষত / পাপের ব্যাধির মত দহে।' রহস্য রোমাঞ্চ ঘেরা কবি মানসিকতায় দূরে অভিযান শেষ পর্যন্ত নীড়ে ফিরে আসতে চায়। দেশকাল সব ছাড়াতে ছাড়াতে / ছাড়াবে কি প্রাঙ্গণ / সীমার শাসনে প্রাণে প্রাণে যেথা / পরম আলিঙ্গন। ['অগাণিতিক' / কখনো মেঘ]।

এই কাব্যে 'লুপলাইনের গ্রাম' কবিতায় যে গ্রামের ভুগোল তুলে ধরেছেন তাতে গ্রামের মৌন মুখর চিত্র হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছে। 'সবুজ শিরোপা বাঁধাতে ঢেঙা তালের পাহারায় / শর ঝোপের ফোয়ারা তোলা, রাঙা মাটির ঢেউ-এ গড়ানো। / শিরিষের ঝুমঝুমি-সীসের ঝর্ঝর / আর কদাচিৎ বন ঘুঘুর গোঁয়ানিতে গাঢ় / বা শহরের চিত্রও 'খুঁজে দেখো, আছে, আছে, নদী, তেপান্তর কিংবা পাহাড়ের কোলে কুণ্ডলিত / তোমার সে শখের শহর। / ধুলো ওড়ে মাছি ঘোরে ভন ভন বোলতা সোনালী / সুরে হেঁকে ফেরি-করা সওদার গায় / চিক্‌ফেলা বারান্দায় তোতা হীরেমন দাঁড় ইত্যাদি।

কবির স্থলপথ ছাড়া আকাশপথেও অভিযান থেমে নেই / 'সাগর পাখীরা' প্রতীকে তিনি কোন্ অচেনা দেশের জন্যে উৎসুক। সাগর পাখীরা উড়ে চলে তাই, / আকাশের কোনখানে সীমা নাই। চাঁদের নয়নে জল / মেঘমায়া ছলছল / সিন্ধু যে উতলা সদাই। ['সাগর পাখীরা' / সম্রাট]

স্থলপথে দারুচিনি দ্বীপের কথাও অলভ্য নয়। 'মশলার দ্বীপ থেকে ভেসে আসা গন্ধ শ্বাস, / পলাতক, অপ্সরা অস্ফুট।' ['কালরাত' / সম্রাট]। আবার আশ্চর্য রোম্যান্টিকতা তিনি পেয়েছেন অভিযান না করেও প্রেমিকার চোখের মাঝে ঃ

'জানালা রুধিয়া দাও / জাহাজ ডাকিয়া যাক / সুদূরে বন্দরে। দিগন্ত পিপাসা যদি / কিছুতে না মেটে তবে / এস খুঁজি দুজনার চোখে।' [জাহাজের ডাক / সম্রাট] অবশ্য কবি কোন দেশে নয়, কবির মৃত্যু জয়ী স্বপ্ন আর আশা 'অক্লান্ত পাখায় বহি তৃপ্তিহীন আকাশ পিপাসা / তিমির রাত্রির পারে চলে।' [মৃত্যুত্তীর্ণ / সম্রাট]

সে যাই হোক প্রেমেন্দ্র মিত্র কল্লোল যুগের সবচেয়ে বেশী দেশ-বিদেশের পুস্তক পাঠক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভুগোল ও প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস পড়েছেন এবং সেই সঙ্গে কল্পনার রঙের তাঁর অভিযান ঘটেছে কবিতার ছত্রে ছত্রে আর ঘনাদা পর্যায়ের কাহিনীতে। তাঁর ভৌগোলিক চেতনায় তাই

বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার মেলবন্ধন ঘটেছে। নিজে পৃথিবীর অনেক দেশে গিয়েছেন, সিনেমা জগতের অভিজ্ঞতা আছে। বুদ্ধদেব বসু যে প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে একেবারে কল্পনাভিত্তিক কাহিনীকার বলে বর্ণনা করছেন সেটা তাঁর প্রথম জীবনের লেখায় কিছু সত্য হলেও সমগ্র জীবনের কবিতায়, উপন্যাসে, সায়েন্স ফিকসানে বাস্তবতার ছোঁয়া অনেক আছে। ১৯৩০ সালের পূর্বেই কিছু কিছু সময় বিহারের ঝাঝায় কাটিয়েছেন, তারপর 'ঘনাদার গল্প' রচনা শুরু। এরপর আমেরিকায় গিয়ে ঘনাদার গল্প নিয়ে অসামান্য সম্মান পান। ফলত আরো বেশী করে দেশ-বিদেশের ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব ভুগোল জানতে আগ্রহী হন। সেই আগ্রহের ফসল তার 'সূর্য কাঁদলে সোনা' যা ইতিহাস ভুগোল এর এক পরিমিশ্রিত উপাদান।

এরপর বিখ্যাত কাব্য 'সাগর থেকে ফেরা'। বোম্বাই ফিল্মিস্থান কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে কবি কবিতা লেখায় মগ্ন হলেন। এ কাব্যের শিরোনাম সাগর থেকে ফেরার মধ্যেই তাঁর নাবিক মনের প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি যেন সাগরে— সাগর থেকে ফিরে শেষে তীরে বা অন্য কোথাও এসেই সান্ত্বনা পেয়েছেন। তাই বলেন, 'আমার নাবিক মন / যে প্রবাদ করে না বিশ্বাস, যাত্রী ও পণ্যের বোঝা / বয়ে বয়ে' বন্দরে বন্দরে, / বেচা-কেনা লেনদেন সব সেরে, শুয়ে পাটাতনে, / তারাদের ইসারায় তবু মনে হয় / মানচিত্রে পড়েনি ধরা, / কম্পাসের কাঁটাও চেনে না, / এমন দিগন্ত বুঝি কোনোখানে আছে অপেক্ষায়।' অর্থাৎ কবির ধারণা এমন কোন স্থান নিশ্চয় আছে যেখানটি কম্পাসেও ধৃত নয়। কোথা সেই স্থান? এখানেই ভাববাদিতার আলো প্রতিভাত কিন্তু পর্যটকের পক্ষে এই ভাববাদী হওয়ায় অর্থ জীবনকে দ্বৈত ভূমিকায় দেখা। এখানেও সেই দোলাচলবৃত্তি যা 'প্রথমার' 'সম্রাটে'র মধ্যে দেখা গেছে। এবং সেইজন্য তাঁর পর্যটন যে সাজানো বিলাস সত্যিকারের পর্যটন নয় সেকথা কবি নিজেও অস্বীকার করেন নি। কবি এই কাব্যেরই অন্য এক জায়গায় বলেছেন, 'কোথাও প্রবাসী নই! / এ সমুদ্র, এ নারিকেল বন; / কবেকার ফেলে আসা দুরাশার মত / আদিগন্ত পাল অগণন, / সব বুঝি আছে মনে, / শোণিত- স্মরণে। / স্বাদ নিতে আসি শুধু / ভানকরা নব—পর্যটনে' ['স্মৃতি'] এখানে ঠিক কবি রবীন্দ্রনাথের কথায় রামের জন্মস্থান অযোধ্যা কবির মনোভূমির চেয়ে সত্য নয়— এই দৃঢ়তা প্রকাশমান। কবি যেন কোথাও যাননি আবার মনে মনে সব স্থানেই যেন পরিভ্রমণ করেছেন। তাই কবির পর্যটক মন একদিন কোন হ্রদ খুঁজে পায় যেখানে এক অনাবিল সহৃদয়তার আস্বাদ আছে। তা যতই অস্পৃশ্য হোক কবির কাছে 'এ শুধু ধারণাবদ্ধ আকাশের বিম্বিত চেতনা,

প্রথম কলুষ স্পর্শে আপনার আত্মাই হারায়।' ['হ্রদ'] আর সেই জন্যে তন্ন তন্ন করে পর্যটক হ্রদ আবিষ্কার করেই সেই জলপান প্রত্যাশায় হ্রদের মতোই 'আপনার আত্মা' হারানোর হৃদয় চান।

পরবর্তী কাব্য 'হরিণ-চিতা-চিল'। এই কাব্যের একটি কবিতায় কবির ভ্রমণপিয়াসী মন যেতে চায় ঘুম-পাহাড় এবং জুড়নদ্বীপ। এই দুটি পদার্থের কি অস্তিত্ব আছে ? কবির কল্পনার পাখী এই শহরের কোথাও এই ঘুম-পাহাড় জুড়ন দ্বীপ পেয়ে যাবে এই বিশ্বাস আছে। তাই কবি বলেন, আছেই তবু আছে কোথাও ঘুম পাহাড়। / জুড়ন-দ্বীপও নয়'ক অলীক স্বপ্নসার। / এই শহরের রাস্তা সারাও, / বাড়াও ত / পারে পারে-ই জুড়ন দ্বীপ আর ঘুম পাহাড় !' 'ঘুম-পাহাড় জুড়নদ্বীপ']।

এই কাব্যে আবার সেই প্রাচীন ইতিহাসমগ্নতাও লভ্য। মহাকবি কালিদাসের অমরাবতী উজ্জয়িনীতে কবির মানস-ভ্রমণ। সে-উজ্জয়িনী বিলুপ্ত হলেও আজ কবি মনে মনে ঘুরছেন। 'তোমার সে উজ্জয়িনী, অক্ষয় অম্লান / ছন্দিত অমরাবতী। / যুগে যুগে চলে যাত্রীদল / সে মহা-তীর্থের পানে, / যাবে চিরদিন, সৌন্দর্য পিপাসী যারা।' ['কালিদাস'] কবির তাই সৌন্দর্যাভিসার চলেছে মহাকবির শিপ্রা নদী তীরে প্রাচীন উজ্জয়িনী রূপনগরীর প্রাসাদে প্রাসাদে। এখানেও কবির ভৌগোলিক মানচিত্রখানি প্রাচীন ইতিহাসের কালিতে ছোপানো।

সব শেষ 'নদীর নিকটে' কাব্যে কবির পরিভ্রমণ ভারতের মধ্যেই। একদিন বলেছিলেন আমাদের সীমা দক্ষিণে সুন্দরবন উত্তরে টেরাই বা উত্তুঙ্গ গিরি। আজও সেই বাংলা ভারতের সীমারেখার মধ্যেই তাঁর অবস্থান। তিনি কলকাতাবাসী। ক্লান্ত মন মাঝে মধ্যে ভাবে পালাবে কোথায় যেখানেই যাক্ না কেন কলকাতার চৌরঙ্গী তাঁকে পাপের মতো টানে। কবি বলেন, অন্য কোথায় পালিয়ে যাবো / 'সবাই ভাবে, / দার্জিলিং কি দীঘা, পুরী / প্রয়াগ, হরিদ্বার / কিংবা আরো সুদূর কোনো / শুদ্ধ নির্জনতায় / ডালহাউসি, কুলু কি আলমোড়া। / যেখানেই যাক। পেট্রোল আর ডিজেল-ধোঁয়ায় / খুনে গন্ধ পাপের মতো টানে, / সঙ্গে ফেরে রক্তে বিষের মতে / চৌরঙ্গী'। ['চৌরঙ্গী'] এখানেই প্রশ্ন যে কবি সারা জীবন কলকাতাকে ভালোবেসেছেন। যে কবির লেখায় ন্যায় জীবনের অলি-গলির বীভৎস রূপ ফুটে উঠেছে সেই কবিই স্বাভাবিকভাবেই চৌরঙ্গীর ঝলমলানো নিয়ন—বিজ্ঞাপনের ভেতরে যে একটা আদিম বিবর রয়েছে তা জানেন কিন্তু তা সত্ত্বেও এই চৌরঙ্গীতে যে অপরিচয়ের ব্যাপক রূপ তুমি-আমির শূন্য খোলস থাকে না—এই আনন্দই তাঁকে এখানের ঘূর্ণিপাকে ঘোরায় তাই

তাঁর এই এত ভালো লাগা চৌরঙ্গীই যেন তাঁর ভৌগোলিক পরিক্রমায় নিত্য-সঙ্গীর মতো এসে দেখা দেয়। তাই 'দুনিয়া খুঁজে যেখানে যাও। ইতিহাসের একই অবোধ করুণ ঘূর্ণিপাক ! /' চৌরঙ্গী তাঁর সমস্ত ঠিকানা হারিয়ে দিয়েছে।

কবি যতই বিশ্ব পর্যটনে ব্যস্ত থাকুন কবির স্বদেশই পরম কাঙ্ক্ষিত। তিনি তাই ইতিহাসের ধারা বেয়ে যাবেন না 'প্রাগুষার তিমিরে' অথবা ভৌগোলিকের মতো ভূতত্ত্ব জানতে, এমনকি তাত্ত্বিকদের চোখেও তাঁর হদিশ নেই, রাজনীতিকের মানচিত্রেও তা মেলে না। তিনি তাই উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, 'আমার স্বদেশ / ভৌগোলিক এক মুখার। বিবর্তন-বিধাতার বুঝি / কিমাশ্চর্য কিস্মিত, / সমতল দিগন্তের দেশে / মানুষকেই যা করে অভ্রভেদী, / পলিমাটির পেলবতা যাতে হয় বজ্রকঠিন।' ['স্বাদেশিক।']।

প্রসঙ্গত বুদ্ধদেব বসু কবি অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভৌগোলিক চেতনার তুলনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, Geography is present also is the work of Amiya Chakravorty, but with a difference. Premendra's experience of the wide world is through book and films, Amiya Chakravorty's through the reality. This, I hasten to add, implies no valuation. To the imaginative a representation can be as stimulating as the object, the experience of books as valid as that of life, and even more so. The distinction I want to make is this : Premendra roams in fancy 'picking up facts on the way : whereas facts Amiya Chakravorty's material and fancy theis editor and commentator. The former describes places remote not space only, but in times as well, the latter is intensely contemporaneous [An Acre of given grass : Orient Longman 1948—Pages 48-49].

অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসেছেন এবং ১৯৩০ সালে ইংল্যান্ডে অধ্যাপনা ও বক্তৃতার জন্য যান পথে ১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালে দুবার রবীন্দ্রনাথের সহকারী রূপে রাশিয়া আমেরিকা ও ইরাক পারস্য দেশে ভ্রমণ করেন। ১৯৩৭ সালেও তিনি অক্সফোর্ডে ছিলেন, ১৯৩৯ সালে লাহোরে এবং ১৯৪৮ সাল থেকে মৃত্যুর প্রায় পূর্ব বছর পর্যন্ত ছিলেন মার্কিন প্রবাসী। সুতরাং তাঁর প্রত্যক্ষভাবে বিস্তৃত জগতের সঙ্গে পরিচয় এবং সেই সূত্রে কবিতায় সে ছবিগুলি ছড়িয়ে আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

দেশগুলি বারে বারে তাঁর কবিতায় এসেছে। যেমন: পুবীনদী, / যন্ত্রণার ঝাপসা রাত্রে প্রগাঢ় শিরায় অন্তঃশীল / মানহাটানের পাশে। / তুমি / বাজিটালের ঘুমে প্রান্তে জাগো শ্যামস্রোতোধ্বনি / প্রশমিত শয্যাঘরে। / ব্রডওয়ের ন্যুইয়র্ক নিশাচর ইত্যাদি [ঈস্ট রিভার / পালা বদল]

তীর্থ ল্যাম্বারেনে, / অ্যালবার্ট সোয়াইট্জার আজো প্রায়শ্চিত্তে নেমে / আশ্রমে নিত্যশ্রমে দুর্ভেদ্য আহত আফ্রিকায়, / বাঁধেন ক্ষতের অভিশাপ, অগোয়ের তীরে নিশ্বসিত / বাণী সে যোগের। 'আফ্রিকা স্বাক্ষর' / ঘরে ফেরার দিন]

এত পার্থক্য হলেও প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অমিয় চক্রবর্তীর এই ভৌগোলিক চেতনা আর অভিযাত্রী মনের একটি বিষয়ে কিন্তু মিল আছে। প্রেমেন্দ্র যেমন সাগর পাখী হয়ে জল-স্থল অন্তরীক্ষ ভ্রমণ করেও শান্তি পান না, নীড়ে ফিরে এসে মনে অভূতপূর্ব শান্তি পান, তেমনি অমিয় চক্রবর্তীও ঘরে ফিরে এসে শান্তি লাভ করেন।

"বাড়ী ফিরেছি।
জারুলের বেড়া ; কাঁকর পথ থামবে দরজায়।
আমার পৃথিবী
এখানেই শেষ।" ['ঘর' / খসড়া]

যেমন প্রেমেন্দ্র স্বচ্ছন্দে বলতে পেরেছেন:

'নিরুদ্দেশের পালতুলে তবু
নিজের সীমায় দুলবে। ['নিরর্থক' / হরিণ-চিতা-চিল']

'রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই' ঃ প্রসঙ্গ হুইটম্যান

আধুনিক আমেরিকীয় কবিদের মধ্যে প্রথম ওয়াল্ট হুইটম্যান। তাঁর কাব্যেই রোমান্টিকতা তুঙ্গ স্পর্শ করেছিল। তাঁর 'লীভস্ অব গ্রাস' কাব্যখানিতে রোমান্টিকতা পরম ও চরম পর্যায়ে পেঁাছেছিল। যদিও আমেরিকার রোম্যান্টিক আন্দোলনকে কোলরিজ, কার্লাইল, সুইডেনবার্গের রচনাবলী, জার্মান আদর্শবাদিতা, প্লাটোনিকতা, প্রাচ্যধর্ম আন্দোলন প্রাণবন্ত করেছিল, তবুও হুইটম্যানের এই লীভস্ অব গ্রাস কাব্যখানিতে এসে এই রোম্যান্টিকতা যেন পরম সিদ্ধি লাভ করেছিল।

হুইটম্যানের জন্ম ওয়েস্ট হিলস্-এর লঙ আইল্যান্ডে ১৮১৯ সালের ৩১শে মে। বাবা ছিলেন ছুতোর এবং কাঠুরে। ব্রুকলিনে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা। তারপর একটা উকিলের অফিসে বছর দুই কাজ। তাও ছেড়ে শিক্ষকতা। শিক্ষকতাও ছেড়েছেন, ধরেছেন সাংবাদিকতা। ওদেশের উঁচু মানের সাপ্তাহিক 'দি মিরর' পত্রিকায় লিখেছেন কিছু কিছু, তারপর নিজেই ১৮৩৮ সাল নাগাদ সম্পাদনা করেছেন একটি সাপ্তাহিক 'লঙ আইল্যান্ডার।' এই সাপ্তাহিকের তিনি একাধারে সম্পাদক, মুদ্রক এবং প্রকাশক। হঠাৎ-তাঁকে 'নিউ ওয়ার্ল্ড' পত্রিকার মুদ্রক (compositor) হিসেবে দেখা গেল ১৮৪১ সালে। আবার যে মানুষটি ঘরকুনো, তিনিই হঠাৎ একটুখানি সমুদ্র ভ্রমণ করে এলেন, কাজ তাঁর বদলে গেল, হলেন ব্রুকলিনের ডেইলী ঈগলের সম্পাদক। সেটা ১৮৪৯ সাল, এর পরে সব কাজ ছাড়লেন। ঝুঁকলেন কার্পেন্টারিতে ১৮৫৩-তে তাও বছর দুই। তারপর তাঁর বাবার মৃত্যুর পর তিনি একাজও ছেড়ে প্রকাশনাতে মন দেন, বেরোয় তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'লীভস্ অব গ্রাস।' তাতেও তিনি স্বস্তি পেলেন না। আমেরিকার যুদ্ধে ১৮৬৩ সালে তিনি নার্স হিসেবে যোগ দিলেন, আর যুদ্ধের শেষে একটি সরকারী কেরানীর কাজ পেলেন বটে, কিন্তু তাও চলে গেল লীভ্স অব গ্রাসের নতুন সংস্করণের জন্য। প্রেস কপি সেক্রেটারী হাটলনের হাতে পড়ে, তিনি কোনরকম কারণ দেখিয়ে ছাঁটাই করলেন হুইটম্যানকে। ইনিই

বিখ্যাত কবি হুইটম্যান। বোহেমীয় জীবন। কোন কাজেই তিনি শান্তি পাচ্ছিলেন না। এ কাজ ছেড়ে ওকাজ। অথচ এর মধ্যে তিনি লিখেছেন বিশাল কাব্য লীভস্ যার পঞ্চম সংস্করণে 'ড্রামট্যাপস্' যুক্ত হয়েছিল, লিখেছিলেন ১৮৭৫ সালে মেমোরেন্ডা ডিউরিং দ্য ওয়ার, স্পেসিমেন ডেজ (১৮৮২), নভেম্বর বাওজ (১৮৮৮) এবং শেষ ১৮৯১ সালে গুডবাই, মাই ফ্যান্সি। এই বিখ্যাত কবির প্রয়াণ ১৮৯২ সালের ২৬শে মার্চ।

ঠিক এখানেই আমরা কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে সব সাদৃশ্য পাই না। সাদৃশ্য পাবো জীবনপ্রকৃতি এবং কাব্যকৃতিতে। প্রেমেন্দ্র মিত্র যখন কলম ধরেন তখন বাংলা কাব্যের রোমান্টিকতায় রবীন্দ্রনাথ প্রধান এবং তাতে যেমন স্বপ্নময়তা ছিল, ছিল দূরচারিতা, ছিল ভাবালুতা। রবীন্দ্রোত্তর পর্বে প্রথম আধুনিক কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর কবিতায় রোম্যান্টিকতা একটা নবতর পর্যায়ে পেঁছেছিল। তাঁর রোমান্টিকতায় ছিল রিয়েলিজমের সংশ্লেষ।

ইনিও কোথাও কোন এক কাজে বন্ধ হয়ে থাকেননি। প্রেমেন্দ্রের বাবা ছিলেন সরকারী চাকুরে, তবে শৈশবে মাতৃহারা হলে দিদিমার কাছেই মানুষ। হুইটম্যানের মা ছিলেন খুবই সন্তানবৎসল, তাঁর স্বার্থশূন্য প্রকৃতি পুত্র হুইটম্যানকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে। কিন্তু প্রেমেন্দ্র সাত / আট বছর বয়সে মাকে হারিয়েছেন, তাই মাতৃস্নেহ কেমন তিনি খুব বেশী জানতে পারেননি, কিন্তু দিদিমার আদর তাঁর মূলধন ছিল। তাঁর স্মৃতিচারণায় জানা যায় যে তাঁর মা ছিলেন শিক্ষিতা, ঢাকা উয়ারী থেকে প্রকাশিত 'ভারত মহিলা' পত্রিকা আসতো তার কাছে। এসব অবশ্যই প্রেমেন্দ্রের মানসিকতার মধ্যে কাব্যগুণের অংকুরোদগমে সাহায্য করেছিল। তবে তাঁর জীবন হুইটম্যানের মতোই বোহেমীয়। কোন কাজেই তৃপ্তি পাননি। ১৯২০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে একবার সাহিত্য, আর একবার কৃষি, আবার তা ছেড়ে বিজ্ঞান পড়লেন। কোন বিষয়েই নিবিষ্টভাবে পড়াশোনা হলো না। কাজ করা শুরু করলেন, কিন্তু কোন কাজেই স্থায়ী হোল না। ১৯২৩ সালে চড়কডাঙা এম. ই. স্কুলে শিক্ষকতা, তা কিছুদিন করে ১৯২৫-২৬ সালে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের গবেষণা সহকারীর কাজ, তাও ছেড়ে দিলেন। ১৯২৮ সালে 'বাংলার কথা' দৈনিকের সহকারী সম্পাদক হলেন, তাও তাঁকে শান্তি দিল না। এরপর 'সংবাদ' এর পরে 'খবর' পত্রিকার সম্পাদনা। কোন কাজই তার মনঃপূত নয়। তাই বেঙ্গলইমিউনিটিতে কাজ নিলেন (১৯৩১-৩২) বন্ধু শিবরাম চক্রবর্তীর অনুরোধে, তাও মাস ছয়েকের জন্যে। তারপর 'রং মশাল' সম্পাদনা। এরপর

নবশক্তি সম্পাদনা (১৯৩৬) এরপর দীর্ঘ উনিশ-কুড়ি বছর সিনেমা জগৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তারপর আবার ১৯৫৪ সালে বোম্বে ফিল্মিস্থান কোম্পানীতে কাজ নিয়ে যান, সেখান থেকে তিন বছরের চুক্তির পূর্বেই ফিরে এসে ১৯৫৫ সালে আকাশবাণীর প্রোগ্রাম প্রোডিউসার হিসেবে কাজ করেন। তারপর ১৯৬২ সাল থেকে পরিপূর্ণভাবে সব কাজ ছেড়ে সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ। হুইটম্যান দীর্ঘ বিশ বছর সাংবাদিক হিসেবে আমেরিকায় পরিচিত ছিলেন, প্রেমেন্দ্র মিত্রও দীর্ঘ দিন সাংবাদিকতায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর প্রয়াণ ১৯৮৮ সালের ৩রা মে।

এই দুই কবির কাব্যে মৃত্যু এবং প্রেম বড় বিচিত্র ভাবে দ্যোতনা লাভ করেছে। হুইটম্যান নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনকে উপলব্ধি করেছেন, মৃত্যুতো তাঁর কাছে অনুপম হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রাচ্য ধর্ম ও দর্শন তাঁর চেতনায় এক নতুন আলো এনে দিয়েছিল, প্রাচ্যের অতীন্দ্রিয়তা তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল। ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে একটি জায়গায় বলেছেন, শৈশব থেকেই তাঁর মনের মধ্যে একটা মিস্টিকতা ছিল, যা তিনি দেখেছেন, তা আত্মস্থ করেছেন, পৃথিবীর দুঃখসুখের আনন্দকে তিনি সমানভাবে গ্রহণ করেছেন। জীবনের ক্ষেত্রে মৃত্যু তাঁর কাছে একটি অপরিহার্য বিষয় অন্য কোন কিছু নয়। কোনদিন তিনি চার্চে যাননি, অথচ অন্তর সত্তার মধ্যে যে আলোকজ্জল রূপ তিনি রচনা করেছিলেন, তার দ্বারাই তাঁর জীবনের বিকাশ। রোলাঁ বলেন, 'The starting point with whitman was in the profundities of his own race, of his own religious life—paradoxical though it may seem. ......He was a great religious individualist, free from all church and all creeds who made religion consist of entirely inner illumination. The secret silent cestasy...such a moral disposition in Whitman was bound to bring about from his childhood, a habit of mystic concentration having no precise object, but filtering nevertheless through all emotions of life'. ১. তাঁর কাব্য ধারায় হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিক ভাব এক নতুন রূপ এনেছিল। তাই প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের মৃত্যুতে তিনি সহজে স্বাগত জানাতে পেরেছেন,

"এসো মধুর মৃত্যু
এসো সান্ত্বনা

আন্দোলিত হয়ে বয়ে যাও
সমস্ত পৃথিবীকে ঘিরে
শান্ত গভীর চির আগন্তুক,
এসো দিনে
এসো রাতে
এসো সকলের প্রত্যেকের কাছে
আজ কি কাল।
হে কমনীয় মৃত্যু
অতল এই বিশ্বের
স্তুতি গাই
অভিনন্দিত করি জীবন ও জীবনের উল্লাস
বস্তু ও বিচিত্র জ্ঞান
আর ভালবাসা
মধুর ভালবাসা
কিন্তু সবচেয়ে উচ্ছলিত স্তুতি গাই
মরণের অমোঘ স্নিগ্ধ আলিঙ্গনের…"

[সমাপ্ত সঙ্গীত / when lilacs last in the doory and blom'd Memories of President Lincoln] হুইটম্যানের শ্রেষ্ঠ কবিতা : প্রেমেন্দ্র মিত্র]

দ্রুত হোক বা বিলম্বে হোক মৃত্যুকে আহ্বান তিনি জানাতে পারেন কারণ তাঁর কাছে রহস্যময়তা, নির্বাণ, রাত্রি, বিস্মৃতি সব সমান। তিনি তাঁর লীভস্ কাব্যে এক দুবার 'মায়া' বা নির্বাণ শব্দ ব্যবহার করেছেন [calamus : 'The basis of all metaphysics, avatur [Song of Farewell] and Nirvana [sands of seventy, 'Twilight'] যুদ্ধে নিহত সৈনিকের মৃত্যু তাঁর কাব্যে বাস্তবতা লাভ করেছে তাইতো বলেছেন,

Then to the third—a face nor old child nor old, very calm, as of beautiful yellow white ivory, young man. I think I know you - I think this face is the face of the chirist himself dead and divine and brother of all, and here again he lies.

প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের মৃত্যুতে তিনি যেমন বলতে পেরেছেন যে তিনি তাঁর

মৃত্যুতে নিজেও শোকমগ্ন, তেমনি আবার মৃত্যু এত সহজ যে নেতাকে আবেগের সঙ্গে যেন ঘুম থেকে ওঠার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছেন।

হে অধিনায়ক। হে আমার অধিনেতা!
ওঠো ওঠো ঘণ্টা বাজছে শোন,
তোমার জন্যে নিশানা উড়ছে, ভেঁপু বাজছে,
ফুলের মালা আর রেশমে মোড়া পত্রগুচ্ছ,
তীরে তীরে জনতার ভীড়—
তোমায় ডাকছে উচ্ছ্বসিত জনতা,
তাদের উদ্‌গ্রীব মুখ উর্ধ্বে তোলা.
হে অধিনায়ক হে প্রিয় জনক।

তীরভূমি আনন্দে উচ্চারিত হও।
ঘণ্টারা বেজে ওঠে,
আমি কিন্তু বিষাদ-পীড়িত মনে পাটাতনে পাইচারি করছি
যেখানে আমার অধিনায়ক পড়ে আছে
মৃত আর হিমশীতল। [প্রেমেন্দ্রকৃত অনুবাদ]

এখানে মৃত্যুকে তিনি প্রথমে 'ঘুম' বলে মনে করলেও পরিণতিতে তাঁর চেতনায় মৃত্যু মৃত্যু হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছে। এত বাস্তব তিনি। যদিও তাঁর মনের মধ্যে হিন্দু বৈদান্তিক দর্শন দানা বেঁধেছিল তবুও তাঁর চেতনার বাস্তববাদিতার পূর্ণ রূপায়ণ দেখা যায়।

প্রসঙ্গত প্রেমেন্দ্র মিত্রের মৃত্যু চেতনাও আলোচনা দরকার। হুইট-ম্যানের মতো প্রেমেন্দ্রও বস্তুবাদী। কিন্তু তাঁর মধ্যেও একটা অতীন্দ্রিয় ভাব ছিল যা কোন কোন কবিতায় দেখা গেছে। তিনি বলেছেন,

যা বোঝ যা জানি তার নিচে
প্রাণের খোদাই চলে
মহামুক্তি মন্ত্র খোঁজা
সংগোপন সত্তামূল বীজে।

জানি তাই গভীর গহনে / সময় প্রবাহ নয় শুধু। /
আলোছায়া দুঃখ সুখ / হৃদয়ের মেরু আর মরু—/
শুধু অনুভূতি নয় / জীবনের লাভ আর ক্ষতির হিসাবে। /
এক পিঠে এ সত্তার সময় বাহিত / উদয়াস্ত ইতিহাস চলে, /
অন্য পিঠে খুঁজে ফিরি / নিজেকেই নিজের অতলে।'

[দু'পিঠে / নদীর নিকটে]

এই যে নিজেকেই নিজের অতলে খোঁজা এতে উপনিষদের 'আত্মানং বিদ্ধি'। নিজেকে জানাইতো শেষ জানা। তাই তাঁর 'প্রথমা'র মধ্যে মৃত্যুকে একপ্রকার অবহেলা করা হলো। লিখলেন 'মৃত্যু কে মনে রাখে? মৃত্যু সে'ত মুছে যায়'। সত্যিই তো জীবন নিয়ে আমাদের খেলা, মৃত্যু নিয়ে নয়। এই কাব্যে মৃত্যুকে অপরিহার্য রূপেও বলা হয়েছে। বিধাতা ক্ষুধা ও দুঃখের সঙ্গে মৃত্যু দিয়ে মানুষের জীবনে চরমতা এনেছেন ('মাটির ঢেলা') কিন্তু 'সম্রাট' কাব্যে মৃত্যু আরো ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে এলো। মৃত্যুত্তীর্ণ এক আলোর সন্ধানী কবি প্রেমেন্দ্রকে দেখলাম। কবি লিখলেন, মৃত্যু-আলিঙ্গনমুক্ত জানিয়াছি / শুভ্র দুই পাখি / উড়ে চলে গেছে যেথা, / অপরূপ ধবল বলাকা / সঞ্চালিছে জ্যোতির্ময় পাখা।' (মৃত্যুত্তীর্ণ / সম্রাট)

কিন্তু এই সম্রাট কাব্যেই কবি লিখেছিলেন এক সম্পূর্ণ নতুন কথা :

মেয়েদের চোখ আজ চকচকে ধারালো!
নেচে নেচে ঢেউ তোলা, নাচের নেশায় দোলা
মিশকালো অঙ্গে কি চেকনাই!
মৃত্যুর মৌতাতে বুঁদ হয়ে গেছি সব
রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই!
হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

কবি আফ্রিকার আরণ্য উল্লাসের 'হে-ইডি, হাইডি, হা-ই' শব্দ-বিন্যাসে সে দেশের নারীর নৃত্যচ্ছটার বর্ণনা করতে গিয়ে তাদের অঙ্গের তরঙ্গায়িত রূপলাবণ্যকে মৃত্যুর সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। রমণীর প্রেম পুরুষের জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় কিন্তু সেই প্রেম কি মানুষের মৃত্যু আনে? অথবা কি অন্য কথা বলতে চান কবি যে রমণীর প্রেম অনেক সময় মৃত্যু ডেকে আনে অথবা প্রেম এবং নারী উভয়েই সমান উপভোগ্য? মৃত্যুকে যে উপভোগ করতে পারে সেইতো বীর। প্রেমকে যে উপভোগ করতে পারে, সেও বীর। সত্যিকারের উপভোগ করার যোগ্যতা তো সব পুরুষের নেই। রমণীর প্রেমকে গ্রহণ করার মতো সাহস ও যোগ্যতা সব পুরুষের নেই বলেই তো সংসারে অশান্তি আসে, যেমন মৃত্যু অবধারিত সত্য অথচ মৃত্যু আছে বলেই জীবনের এত সুনিপুণ গঠন। তাই রমণী ও মৃত্যু সমার্থক। কবি প্রেমেন্দ্রও মনে করেন যৌবনের শক্তি দিয়ে রমণীকে পেতে হয়, যৌবনের সাহস দিয়ে মৃত্যুকেও আলিঙ্গন জানাতে হয়।

কবি হুইটম্যানও বলেছেন :

Copulation is no more rank to me than death is (Ins-

cription / Leaves of Grass. Line 521) সুতরাং copulation কবির কাছে মৃত্যুর চেয়ে কোন ভিন্নতর মর্যাদা নিয়ে আসেনি।

হুইটম্যান নারী পুরুষের সম্পর্ককে খুব সহজভাবেই গ্রহণ করেছেন। যৌনবৃত্তি তো স্বাভাবিক। তাকে অস্বীকার করে জীবনের বিকাশ সম্ভব নয়। তাই কাম বা sex তাঁর কবিতায় খুব সরলভাবেই এসেছে। আপাততঃ মনে হতে পারে যে তাঁর কবিতায় animality আছে, কিন্তু সেই নিরিখে তাঁর কবিতার বিচার করলে বাস্তবকে অস্বীকার করা হয়। Song of the Body Electric বা Spontaneous Me কবিতামালায় অনেক স্তবক আছে যাতে নারীর সঙ্গে সম্পর্ক জানা যাবে। তাঁর কথায় একটি পুরুষের দেহ পবিত্র, একটি নারীর দেহ পবিত্র। কামকে কি অস্বীকার করা যায়? যায় না বলেই হুইটম্যান জানালেন যৌনজীবনকে মহিমান্বিত করতে হবে, তা যেন কোনক্রমেই লজ্জার বিষয় না হয়। একটি কবিতা :

'Have you ever loved the body of a woman,
Have you ever loved the body of a man,
Do you not see that these are exactly the
same to all in all
Nations and times all over the earth ?
If anything is sacred, the human body is sacred,
And the glory and sweet of a man is the token of
manhood unfainted,
And in man or woman a clean, strong, firmfibred
body is
More beautiful than the most beautiful face'

হুইটম্যানের কাছে নারী কাল্পনিক সত্তা নয়, নারী নারীই। দেশ ও কালের প্রেক্ষিতে সেই নারীকে উপস্থাপনা করতে চেয়েছেন কবি।

যে দৃষ্টিভঙ্গিতে হুইটম্যান নারী দেহ ও পুরুষ দেহকে পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করলেন, প্রেমেন্দ্র সেই অর্থে নারী দেহকে বিচার করলেন না। তাঁর দৃষ্টিতে রোম্যান্টিক রিয়েলিজম মূর্ত হোল। তিনি চাইলেন সমগ্র মানুষের মানে। অর্থাৎ মানুষের কামও যেমন চাই, তেমনি চাই প্রেমও। লিখলেন, মানুষের মানে চাই—/ গোটা মানুষের মানে। / রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ, মজ্জা, / ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসা সমেত—/ গোটা মানুষের মানে চাই [মানে / প্রথমা]। সত্যি কি সব কিছুর মানে পাওয়া যায়? পাওয়া সম্ভব? যে নারীকে ভালবাসা যায়, তাকে নিয়ে গিয়ে

কি পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করা যায় ? যে নারীকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে পেতে চাই, দেহে ও মনে তার অনুপুঙ্খ বিচার কি কাম্য ? এ প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র নীরব। তিনি ঐ প্রথমার পর্বে যে রোম্যান্টিকতা নিয়ে বলেছিলেন 'তব মমতায় ঘিরে, / অসীম আকাশ-তীরে, / সীমার ধরণী গড়ি মোরা অক্ষয়। / তুমি আছ, তাই গৃহদীপ সনে তারকারা কথা কয় [তুমি / প্রথমা]। তার ক্ষেত্রে 'মানে' খোঁজা ঠিক বেমানান।

হুইটম্যানের মতো প্রেমেন্দ্র বলেছেন, 'ঘথের কড়ি আগলে আছিস মোক্ষ আশার মূর্খ কে ? অর্ঘ্য দে ! এই দেহ তোর দেবতা শুধু, / দিন দুয়েকের স্বর্গ রে ! / অর্ঘ্য দে ! / মরদেহের চেয়ে মূর্খ ; মোক্ষ নয় মহার্ঘ রে ! অর্ঘ্য দে ! / [ইহবাদী প্রথমা] সুতরাং ইহবাদী কবির কাছে মোক্ষ কাম্য নয়। যদিও হুইটম্যান আধ্যাত্মিকতায় আচ্ছন্ন ছিলেন, তবুও তাঁর কবিতায় নারী প্রেম মোক্ষ চিন্তায় আবৃত নয়। তাই তাঁর বাকপ্রতিমাগুলি concrete হয়েছে, abstruct নয়। প্রেমেন্দ্রের কাব্যকারুতেও সেই concrete image দেখা গেছে।

শুধু পরিশেষে তাঁদের নারীপ্রেম ও মৃত্যু প্রসঙ্গ নিয়ে এটুকু বলা যায় উভয়ের মধ্যে দোলাচল বৃত্তি রয়েছে। হুইটম্যানকে কখনো মনে হয় শারীর তত্ত্ববিদ, আবার কখনো কবি, তেমনি ডাক্তারি পড়ার মানসিকতা নিয়ে যে প্রেমেন্দ্র কাব্যকারু রচয়িতা হলেন তাঁর মধ্যেও সেই বিজ্ঞানী বিশ্লেষক একজন লুকিয়ে ছিলেন। তাই কবিতায় তিনি নারী পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক ছেড়ে ল্যাবরেটরিতে যেন তাদের নিয়ে গিয়ে টুকরো টুকরো করে বিশ্লেষণ করতে চান।

আর মৃত্যু যে অর্থে প্রেমে এসে সংশ্লেষ ঘটিয়েছে, তাতে নারী পুরুষের মিলনে যে আনন্দ, মৃত্যুতেও সেই আনন্দ। প্রেমেন্দ্র মনে করেন মৃত্যু intense delight। প্রেম ও আনন্দ, মৃত্যুও আনন্দ। মৃত্যুকে কখনোই এঁরা অনাকাঙ্ক্ষিত মনে করেন না, রবীন্দ্রনাথের কথায় 'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান'। তাই রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই প্রেমেন্দ্রের এই কথা উভয় কবির ক্ষেত্রে সারসত্য বহন করে।

॥ গ্রন্থ নির্দেশ ॥

1. Life of Vivekananda and the universal Gospel. Roman rolland : Advita Ashram Almora 1931 page 67 :

শিল্পরীতির নিরিখে 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার'

বাংলা গল্পের ধারায় রবীন্দ্রনাথের পরেই সার্থক ছোটোগল্পকার হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রই উল্লেখের দাবী রাখেন। তাঁর গল্পের বিভিন্ন রূপ যেমন বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি নির্মাণশিল্পও। কবি যখন গল্প লেখেন তখন গল্পের পরতে পরতে কাব্য সুষমা ধরা পড়ে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে সেই কাব্য-সুষমা অটুট আছে। আবার তাঁর গল্পে যেমন সমসাময়িক কালের চিত্র আছে, তেমনি আছে চিরন্তনতা। 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' এমনই একটি গল্প যা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ পর্বে 'যুগান্তর' শারদীয়া (১৯৪২-৪৪) সংখ্যায় প্রকাশিত। মধ্যবিত্ত সমাজে কন্যার বিবাহদান যে কত ক্লেশকর, বিবাহের বয়স অতিক্রান্ত হলে যে যুবতীর রূপলাবণ্যের চ্যুতি ঘটে সেদিকটাও যেমন গল্পে অবহেলিত হয় নি, তেমনি গল্পে যৌবন উত্তীর্ণা নারীর বৃদ্ধা রোগগ্রস্তা মাতার মনের মণিকোঠায় কোন এক ভাবী জামাতার স্থান আদৌ সত্য নয়, সে আবরণ অনুদ্ঘাটিত থেকেই গেল বৃদ্ধাকে মানসিক কষ্ট না দেবার জন্যেই। গল্পটিকে বিচার করতে গিয়ে আমরা নানা দৃষ্টি-ভঙ্গী উপস্থাপনা করতে চাই কারণ এই গল্পটি সমসাময়িক কালের গল্পমালার মধ্যে মিশ্র রূপমাধুর্যে ঋদ্ধ।

ক. বিষয়বস্তু :

এই গল্পের শরীরে দুটি রূপধারা দুভাবে বহমান। এক, বিষয়বস্তু দুই, টেকনিক অর্থাৎ শিল্পরীতি। বাংলা গল্প সাহিত্যের বিকাশের ধারায় এ গল্পের বিষয়বস্তু এত তুচ্ছ অথচ গল্প বলার ধরনে গল্পটি শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করতে পেরেছে।

গল্পটি নিতান্ত সামান্য। কারণ সারা সপ্তাহে কর্মক্লান্তি অপনোদনের জন্য যদি কোন মানুষ হাতে কিছু সময় পায় তাহলে মহানগরী কলকাতা থেকে মাইল তিরিশেক দূরে কোন এক ব্যাঘ্রসংকুল গ্রামে মাছ ধরতে এবং অবসর বিনোদনের জন্য যেতে পারেন। সেটা করতে গিয়ে দুজন বন্ধু

থাকবেন যাঁরা এ বিষয়ে তত উৎসাহী নন, একজন নিদ্রাবিলাসী, অন্যজন পানপিয়াসী। ফলে প্রথমজন ঐ কম সময়ের মধ্যে যা কিছু প্রত্যক্ষ করবেন তা এমন কিছু উল্লেখের দাবীও রাখে না। একটি ভাঙ্গা-চোরা প্রাসাদের একটি ঘরে যেখানে লোনাধরা দেওয়ালেতে মাঝে মাঝে ধ্বসে গেছে বালি, মাঝে মাঝে স্যাঁতা পড়া দাগ—আগন্তুকরা আসবেন জেনে সামান্য কিছুক্ষণ আগেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের ব্যর্থ চেষ্টা যে হয়েছে তার প্রমাণ মেলে। প্রথমজন গভীর রাতে টর্চ হাতে ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে এক রহস্যময় ছায়ামূর্তি লক্ষ্য করবেন আর কে যে এই বাতায়নবর্তিনী কেন যে তার রাত্রে ঘুম নেই সেকথা ভাববারও চেষ্টা যে প্রথমজন করবেন না তা নয়। তারপর রাত কেটে যাবে, ভোর হবে, বেলা বাড়বে, মাছ ধরার জন্য নানা প্রকার উপচারে তার চেষ্টা চলবে কিন্তু মাছ পড়বে না। ঠিক মনের এমনি এক অস্বস্তিকর মুহূর্তে ঘাটের জলে ঢেউ তুলে এক প্রায় যৌবন উত্তীর্ণা নারী কলসী নিয়ে জল নিতে এসে মন্তব্য করবে যে, বসে আছেন কেন? টান দিন। এই কথার মাধুর্যে বিহ্বলতা জাগায় হাজার মুখো-মুখি দেখার ইচ্ছে থাকলেও তা সংবরণ করতে হবে এবং পরে বন্ধুর মুখে শোনা যাবে যে মেয়েটি পরিহাস করে মৎসকুশলতার যে বিবরণ দিয়েছে তাতে লজ্জা আপনা থেকেই আসে। তারপর সেই মেয়েটি যে বাতায়ন-বর্তিনী বা ছায়ারূপিনী বা ঘাটে কলসী ভর্তি করতে গিয়ে মন্তব্যকারিণী তার পরিচয় মেলে। এবং তার মা যে তারই বিবাহের জন্যে নিরঞ্জন নামক এক দূরসম্পর্কিত বোনপোর বিদেশ প্রত্যাগমনের আশায় জীবনটুকু ধরে রেখেছেন সেটাও বোঝা যায়। লেখকই এখানের প্রথমজন, তিনি বাধ্য হয়ে সেই পরিবেশে কথা দিয়ে ফেলেন যে তিনি আবার আসবেন। এখানেই শেষ নয়, মেয়েটি ছিপ ফেলে যাওয়ার কথা স্মরণ করালে লেখকই বলেন যে একবার মাছ ধরতে পারেন নি বলে তেলেনাপোতার মাছ কি বার বার তাঁকে ফাঁকি দিতে পারবে? অর্থাৎ তিনি মাছ ধরতে আবার এই মোহময় গ্রামে আসবেন। সবশেষে তিনি গ্রাম থেকে কলকাতায় গিয়ে ম্যালেরিয়ায় ভুগবেন কিছুদিন, তারপর জীর্ণ শীর্ণ দেহ নিয়ে বারান্দায় একা একা যখন মনের সঙ্গে কথা বলবেন তখন এই স্মৃতি তাঁর মনের আয়নায় ভেসে উঠে তাঁকে একটু বেদনা দিয়ে যাবে ক্ষণিকের জন্যে। এই হোল বিষয়বস্তু। তেলেনা-পোতা বলে কলকাতা থেকে মাইল তিরিশ দূরে কোন জায়গা থাকা বা না-থাকা নিয়ে চিন্তা নেই। এই গ্রামটি একটি বিশেষ কল্পনা। তবে মূল বিষয়টি হোল এরকম সামান্য বিয়ে দিতে না পারার ঘটনা নিম্নমধ্যবিত্ত বা ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তদের ঘরে ঘটতেই পারে—কিন্তু এই 'ফিরে আসা'র কল্পনাটাই

অভিনব। আর এই ফিরে আসাকে কেন্দ্র করে গোটা গল্পের শরীরের প্রতি অঙ্গে অপূর্ব দ্যুতি খেলে যায়। কি গ্রামের বর্ণনায়, কি পথ-চলতি দৃশ্য-কাব্যে, কি সংলাপে, কি সংগোপনে অলস ভাবনায়। সেই দিক থেকে বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি বিশেষ অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়, যেখানে স্থানিক ও কালিক ঐক্য শুধু নয় বাস্তবতা ও অবাস্তবতার পরিমিশ্রণ গল্পটিকে এক উত্তুঙ্গ শীর্ষে নিয়ে চলে যায়।

খ. কাব্যধর্মিতা ও লেখকের পর্যবেক্ষণ শক্তি :

তেলেনাপোতা আবিষ্কার গল্পটির কাব্যধর্মিতা আলোচনা করার পূর্বে-কাব্য-ধর্ম এর সংজ্ঞা নিয়ে সামান্য আলোকপাত করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। 'কবি তাঁহার অপূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষম প্রতিভার বলে সহৃদয় সামাজিক বা পাঠকের অন্তরে অলৌকিক আনন্দনিস্যন্দী অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের ব্যাপারময় যে শব্দার্থের সাহিত্য বা সহযোগ সৃষ্টি করেন, তাহার নাম সাহিত্য বা কাব্য।'[২] এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে কাব্যের মধ্যে বাক্য বা শব্দও সেই শব্দজাত আনন্দময়তা এবং এর সঙ্গে কাব্যরসও চাই। কবি তাঁর আশ্চর্য প্রতিভার দ্বারা শব্দার্থের ওপারে যে ব্যঞ্জনা, ধ্বনি আলম্বন অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের বিচিত্র বিষয়বস্তু সবই উদ্ঘাটন করবেন। এই কাব্যের মধ্যে থাকে ছন্দ যা শব্দকে তার জড়তা থেকে মুক্তি দেয়। সব মিলিয়ে এই বিচিত্র শব্দের জগৎ অন্য এক অনাস্বাদিত জগতের মাঝে পাঠক গোষ্ঠীকে নিয়ে যায়। সর্বোপরি কাব্য গড়ে উঠলো কিনা তা নির্ভর করে শব্দ কতখানি পাঠক সমাজকে আপ্লুত করতে পারলো তার ওপর। অনেক সময় গদ্যের মধ্যেও এইসব গুণ থাকে তখন তা কাব্যধর্মী হয়ে ওঠে। তবে গদ্য ও কাব্যের মধ্যে যে পার্থক্য তা রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিয়েই বলা যায়, 'পদ্য অন্তঃপুর গদ্য বহির্ভবন। উভয়ের ভিন্নস্থান নির্দিষ্ট আছে। অবলা বাহিরে বিচরণ করিলে তাহার বিপদ ঘটিবে এমন কোনো কথা নাই। কিন্তু যদি কোনো রূঢ়স্বভাব ব্যক্তি তাহাকে অপমান করে, তবে ক্রন্দন ছাড়া তাহার আর কোন অস্ত্র নাই। এইজন্য অন্তঃপুর তাহার পক্ষে নিরাপদ দুর্গ। পদ্য কবিতায় সেই অন্তঃপুর। ছন্দের প্রাচীরের মধ্যে সহসা কেহ তাহাকে আক্রমণ করে না। প্রত্যহের এবং প্রত্যেকের ভাষা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া সে আপনার জন্য একটি দুরূহ অথচ সুন্দর সীমা রচনা করিয়া রাখিয়াছে।'[৩] তবে একথা ঠিক গদ্যে ছন্দ না থাকলেও ছন্দ-স্পন্দ বা Rhythm থাকবেই। আবার রবীন্দ্রনাথের কথায় কাব্যের আর একটি ধর্ম উল্লেখ না করে পারা যায় না। তাহলো, 'বিজ্ঞানে

দর্শনে আমরা জগৎকে জানি, কাব্যে আমরা আপনাকে'।[৪] জানি গদ্যের ছন্দ বৈচিত্র্য প্রধান। পদ্যের ছন্দ—ঐক্য প্রধান।

এতক্ষণ আমরা কাব্যের উপাদান নিয়ে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম তারই পরিপ্রেক্ষিতে 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পটির কাব্যধর্মিতা আলোচনা করা যাক। কাব্যের মৌল উপাদান হচ্ছে শব্দ। সেই শব্দ কতখানি গতিশীল, কতখানি মানুষকে এক বিশেষ আলোকে উদ্ভাসিত করে তা লক্ষ্য করতে হবে। সেই শব্দই অলক্ষ্যে ভেতরে ভেতরে ধ্বনি, অলংকার বা ছন্দের মল বাজিয়ে যায়। বোদ্ধা পাঠকই তা উপলব্ধি করতে পারে। গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদেই একটি বাক্য ব্যবহার রীতিমত বিস্ময়কর। 'অর্থাৎ / কাজে কর্মে / মানুষের ভিড়ে / হাঁপিয়ে ওঠার পর / যদি হঠাৎ / দু-একদিনের জন্যে / ছুটি পাওয়া যায় / আর যদি কেউ এসে / ফুসলানি দেয় যে / কোনো এক আশ্চর্য সরোবরে /– পৃথিবীর সবচেয়ে / সরলতম মাছেরা / এখনো / তাদের জল-জীবনের / প্রথম বঁড়শিতে / হৃদয় বিদ্ধ করবার জন্য / উদগ্রীব হয়ে আছে / আর জীবনে / কখনো কয়েকটা ছুটি ছাড়া / অন্য কিছু / জল থেকে টেনে তোলার সৌভাগ্য / যদি আপনার না হ'য়ে থাকে / তা হলে / হঠাৎ একদিন / তেলেনাপোতা / আপনিও / আবিষ্কার করতে পারেন। এই বাক্যটিতে যে যে পর্ব সংখ্যা চিহ্নিত এর পরের বাক্যে নিশ্চয়ই তা নেই। অর্থাৎ অসমপর্ব নিয়ে এই গদ্যের পর্ব সৃষ্টি। এই বাক্যে পর্ব সংখ্যা আঠাশটি। এই পর্বের মধ্যে পর্বাঙ্গ কিন্তু কখনো এক, কখনো দুই, আবার সর্বাধিক পাঁচ হয়েছে। গদ্যের মাত্রাও অবশ্য স্বভাব-মাত্রিক বলে এখানে উচ্চারণের রীতি অনুসারে কখনো কম কখনো বেশী।

গল্পের সূচনাতেই শুরু হচ্ছে মহানগর ছাড়িয়ে গ্রাম-বাংলার প্রবেশ-পথের পরিদৃশ্যমান চিত্র যা নাগরিক কবির দৃষ্টিতে মূর্ত। সেই দৃশ্য বর্ণনায় লেখা যে গদ্য-বাক্যগুলি উপহার দিয়েছেন তাদের ছন্দ ঠিক ঐজাতীয়। বাক্যটি এরকম : 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' করতে হ'লে একদিন বিকেল বেলায় পড়ন্ত রোদে জিনিষে মানুষে ঠাসাঠাসি একটা বাসে গিয়ে আপনাকে উঠতে হবে, তারপর রাস্তার ঝাঁকানির সঙ্গে মানুষের গুঁতো খেতে খেতে ভাদ্রের গরমে ঘামে, ধুলোয় চটচটে শরীর নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক বাদে রাস্তার মাঝখানে নেমে পড়তে হবে আচমকা। সামনে দেখবেন নিচু একটা জলার মতো জায়গার ওপর দিয়ে রাস্তার লম্বা সাঁকো চ'লে গেছে। তারই ওপর দিয়ে বিচিত্র ঘর্ঘর শব্দে বাসটি চ'লে গিয়ে ওধারে পথের বাঁকে অদৃশ্য হবার পর দেখবেন সূর্য এখনো না ডুবলেও চারিদিক ঘন জঙ্গলে অন্ধকার হ'য়ে

এসেছে। কোনোদিকে চেয়ে জনমানব দেখতে পাবেন না। মনে হবে পাখিরাও যেন সভয়ে সে-জায়গা পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে। একটা স্যাঁৎসেতে ভিজে ভ্যাপসা আবহাওয়া টের পাবেন। মনে হবে নিচের জলা থেকে একটা ক্রুর কুণ্ডলিত জলীয় অভিশাপ ধীরে ধীরে অদৃশ্য ফণা তুলে উঠে আসছে।'

সমগ্র গল্পটির গদ্য কাঠামোর ছন্দ-পর্ব বা পর্বাঙ্গ ভাগ করে দেখানো যেতে পারে যে কোন একটি বাক্য ছন্দহীন নয়। অর্থাৎ কাব্যধর্মিতার একটা বিশেষ উপাদান এই গদ্যটির মধ্যে বিরাজমান। সেই সঙ্গে কাব্যের প্রথম শর্ত যে শব্দ প্রয়োগ, এই গদ্যের মধ্যে তার পরিপূর্ণতা আছে। গল্পের শুরুতেই মহানগরীর কর্মক্লান্ত মানুষের সপ্তাহান্তিক একটু অবসর বিনোদনের ক্ষেত্রে বন্ধুবান্ধবদের সামান্যতম যুক্তি যাকে কবি-গল্পকার গ্রাম্য-শব্দ 'ফুসলানি'তে রূপান্তরিত করেছেন, এবং মৎস্য শিকারী হিসেবে সারাজীবনে ব্যর্থ মানুষও যদি জানতে পারে যে 'কোন এক আশ্চর্য সরোবরে পৃথিবীর সবচেয়ে সরলতম মাছেরা এখনো তাদের জল-জীবনের প্রথম বঁড়শিতে হৃদয়-বিদ্ধ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে'—এই অপূর্ব শব্দ-বিন্যাসে একদিকে যেমন শব্দই যে কাব্যের মৌল উপাদান তা যেমন সার্থক-ভাবে দ্যোতনা লাভ করেছে, তেমনি এই বাক্যটিতে একটি বিশেষ চিত্রকল্প যা আবার কাব্যের ক্ষেত্রেই বেশী করে আসে সেই চিত্রকল্প ঠিক এই মুহূর্তে পাঠক চিত্তে উপস্থাপিত না হলেও গল্পটি শেষ করলে পৃথিবীর সব চেয়ে সরলতম মাছ' যে গ্রামের ঐ যামিনীর মতো সরলা যৌবনোত্তীর্ণা নারীদের ইমেজই – তা ধরা পড়ে! আর তেলেনাপোতা আবিষ্কারকের যোগ্যতা তাঁরই হবে যিনি মাছ-শিকারী হিসেবে ব্যর্থ কারণ মাছ-শিকারে সার্থক হলে তো তিনি অন্যকিছু চিন্তার অবকাশ পাবেন না। এখানেই এই বাক্যের সুর বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে ব্যঞ্জনার পাখা মেলে দিয়েছে। তারপর মহানগরী থেকে বাসে উঠে ভাদ্রের গরমে ঘেমে কয়েক মাইল গিয়ে যে স্থানে শিকারীরা নামবেন, সেখানকার পরিবেশ বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক যে বাক্যগুলি তুলে ধরেছেন তাতে প্রায় সূর্যাস্তের অন্ধকার জঙ্গল আর স্যাঁৎসেতে জন-মানব পক্ষীহীন একটা ভ্যাপসা স্থান পাঠক গোষ্ঠীকে আতঙ্কের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। আতঙ্ক সৃষ্টি করে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষ পংক্তিটি—'মনে হবে নিচের জলা থেকে একটা ক্রুর কুণ্ডলিত জলীয় অভিশাপ ধীরে ধীরে অদৃশ্য ফণা তুলে উঠে আসছে।' সমগ্র বাক্যটিতে একটা সাপের চিত্রকল্প ফুটে উঠলেও ব্যাপারটা যে বাক্যের শুরুতে 'মনে হবে' দুটি শব্দে বিশেষ বাস্তব-অবাস্তবের টানা পোড়েন ঘটিয়ে দিয়েছেন। মনে হয় ভাদ্রমাসে গ্রামে

জলাজায়গায় পাট পচানো হয়, সেই পাট পচানোর বিশ্রী তীব্র গন্ধই এখানে 'অভিশাপ' এবং 'সাপ'ও বটে—যা মহানগরী মৎস্যশিকারী অভিযাত্রীরা কখনোই সহ্য করতে পারেন না—তাঁদের কাছে এটা যে সঠিক অভিধায় পৌঁছেছে এবং এটা গদ্য-গন্ধী ভাষা নয়, কাব্যধর্মী তা বিনা দ্বিধায় বলা যায়। এভাবে বিশ্লেষণ করলে গল্পের ভাষা অর্থাৎ শব্দ, ছন্দ, চিত্রকল্প ইত্যাদির সামগ্রিকতা একটা পূর্ণায়ত রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়।

জলার পাশে নেমে গরুর গাড়ীতে উঠে গ্রামে যাওয়া, একটি ক্ষয়িষ্ণু অট্টালিকায় রাতকাটানোর অভিজ্ঞতা, রাত্রে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় মৃত্যু সুষুপ্তিমগ্ন মায়াপুরীর গোপন প্রকোষ্ঠে বন্দিনী যামিনীকে দেখা-না-দেখার রঙিন-সত্যের প্রকাশ এবং শেষ ছেড়ে চলে আসার সময় যামিনীর ম্লানমুখচ্ছবির নিটোল বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত লেখক কাব্যই প্রকাশ করেছেন। 'এক অমানুষিক কান্না নিংড়ে বার করা', 'চেতনার শেষ অন্তরীপ', ধসে পড়া দেয়াল ও চক্ষুহীন কোটরের মতো পাল্লাহীন জানালা নিয়ে চাঁদের বিরুদ্ধে দুর্গ-প্রাকারের মতো দাঁড়িয়ে থাকা', 'নিদ্রাবিলাসী কুম্ভকর্ণ', 'ফাটলে ফাটলে অরণ্যের পঞ্চম বাহিনী ষড়যন্ত্রের শিকড়' চালানো, ধ্বংসপুরীর অতল নিদ্রা থেকে একটি স্বপ্নের বুদবুদ ক্ষণিকের জন্য জীবনের জগতে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যাওয়া, ষোড়শোপচারে আয়োজন নিয়ে মৎস্য আরাধনার জন্যে শ্যাওলা-ঢাকা ভাঙা ঘাটের একটি ধারে বসে গুঁড়িপানায় সবুজ জলের মধ্যে যথোচিত নৈবেদ্য সমেত বঁড়শি নামিয়ে' দেওয়া, 'এই অজগরপুরীর ভেতর ব'সে সে আশায় দিন গোনা, মনে হবে সেই শূন্য কোটরের ভেতর থেকে অন্ধকারের দুটি কালো শিখা বেরিয়ে এসে যেন আপনার সর্বাঙ্গ লেহন ক'রে পরীক্ষা করছে', গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি যার সুদূর ও করুণ, ধ্বংসপুরীর ছায়ার মতো সেই মেয়েটি হয়তো আপনার কোনো দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব কুয়াশাময় কল্পনামাত্র' প্রভৃতি বাক্যবন্ধে উপমা, ছন্দ, ধ্বনি, চিত্র ও চিত্রকল্পসৌষম্য পরিস্ফুট। তাছাড়া সমগ্র গল্পের মধ্যে একটি বিশেষ সুর প্রতিধ্বনিত। তা হলো গল্পকার ও পাঠকের একাত্মীভূত হওয়ার সুর। গল্পকারের সঙ্গে পাঠকও যেন শুনতে পান',··· নিজের হৃদ্‌স্পন্দনে একটি কথাই বার বার ধ্বনিত হচ্ছে, শুনবেন—'ফিরে আসব, ফিরে আসব।' কবির ব্যক্তিগত আত্মানুভূতি সার্বজনীন আত্মানুভূতিতে রূপান্তরিত হওয়াই গীতি কবিতার লক্ষণ। এখানে যে প্রতারণার চিত্র আছে লেখকের একার নয়, এখন পাঠকেরও বটে। অর্থাৎ গল্পকারের ব্যক্তিগত আত্মানুভূতি সার্বজনীন আত্মানুভূনিতে রূপান্তরিত। সুতরাং গল্পটিতে কাব্যধর্মিতার পরিপূর্ণ সুর পাওয়া গেল।

· ২...

কবি গল্পকার জীবনের অতিতুচ্ছ ঘটনাও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এই গল্পের মধ্যে তাঁর সেই পর্যবেক্ষণ শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

লেখক ও তাঁর দুজন বন্ধু যে মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক তার প্রমাণ গল্পের প্রথমেই আছে। কাজকর্মে ও মহানগরীর ভিড়ে যখন মানুষ হাঁপিয়ে উঠে, সপ্তাহে মাত্র দুদিন ছুটিতে মুক্তির স্বাদ খোঁজে তেমন একটি অবস্থার কথা প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। তারপর ভাদ্রের পচা-ভ্যাপসা গরমে ঘেমে নেয়ে উঠে এঁরা যাবেন মাছ শিকারে মহানগরী থেকে ত্রিশমাইল দূরে কোন এক গ্রামে যেখানে বন্ধুদের মধ্যে একজনের আত্মীয়ার ভাঙা একখানি প্রাসাদোপম বাড়ী আছে। সেখানে একটি রাত্রি অতিবাহিত করার সময় সেই বৃদ্ধা আত্মীয়ার মেয়েকে স্বপ্নের মতো লক্ষ্য করবেন। অনাঘ্রাত কুসুমের মতো সেও ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে। সেখানে মাছ ধরতে পারবেন না তাঁরা। তারপর চলে আসবেন। আসার পূর্বে শুনবেন বৃদ্ধার কাতর আহ্বান 'আমি জানতাম তুই না এসে পারবি না বাবা। তাইতো এমন ক'রে এই প্রেতপুরী পাহারা দিয়ে দিন গুনেছি।' দূর সম্পর্কের এক বোনপো নিরঞ্জন যামিনীকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়ে বিদেশে চলে যায়— সেই পরিপ্রেক্ষিতে বৃদ্ধার প্রত্যাশার সঘনউক্তি। সবমিলিয়ে বিষয়বস্তুতে কোন নবত্ব নেই। বরং তুচ্ছই বলা যায় অথচ এই তুচ্ছ বিষয় পর্যবেক্ষণ শক্তির গুণে অসামান্য হয়ে উঠেছে।

এক. যাত্রাকাল, পথ, পথপার্শ্বের পরিবেশ বর্ণনা করতে করতে লেখক পাঠককুলকে একটা অনাস্বাদিত রোমাঞ্চকর অবস্থার মধ্যে নিয়ে চলেছেন। অথচ সেই জলা—নালা—মশা-মাছি—গোরুর গাড়ী, বাঘ—তাড়ানোর ক্যানাস্তারা বাজানোর বিষয় জানিয়ে দিয়ে পাঠককে সচকিত করে দিচ্ছেন, লেখকের সঙ্গে পাঠকও গোরুর গাড়ীতে চলেছেন যেন এবং লেখকের সঙ্গে পাঠকও যেন উঠেছেন একটি ধসে পড়া অট্টালিকায়, যে ঘরের অধিষ্ঠাত্রী আত্মা যে তাতে ক্ষুব্ধ, একটি অস্পষ্ট ভ্যাপসা গন্ধে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পলেস্তারাহীন দেয়াল, আর চামচিকে, ঝুল, জঞ্জাল, ধুলোও বাদ যায়নি। তারপর মাছ ধরতে বসতে বোঝা গেল লেখক মৎস্য শিকারী হিসাবে অপটু, সারাদিন ব্যর্থ চেষ্টার সঙ্গে ঐ বাড়ীর যৌবনোত্তীর্ণা মেয়েটির সঙ্গে যে সামান্য আলাপ ঘটলো তাতে কিছু অসামান্যতা নেই অথচ সেটিও রোম্যান্টিকতাময় একটি সংলাপ হয়ে দাঁড়ালো। তারপর সাধারণ জীবনে যা ঘটে সত্যকথা অনেক সময় বলা যায় না, মিথ্যায় রঙিন জগতে যাঁরা

থাকেন, অনেকেই তাঁদের সত্যের রূঢ় বাস্তবে টেনে আনতে দ্বিধা বোধ করেন। সেইভাবেই লেখক যেন নিজেই নিরঞ্জনের ভূমিকায় অভিনয় করলেন এবং যেন বলে এলেন, আবার আসব। এমনকি আসার সময় ছিপটি ফেলে আসার মধ্যে যে তুচ্ছ ঘটনা লুকিয়ে ছিল তাও শেষ পর্যন্ত অনবদ্য হয়ে দাঁড়ালো। যামিনী ছিপটি পড়ে রইল বলে স্মরণ করিয়ে দিতেই লেখক যেন বলতে চাইলেন, থাক না। এবারে পারিনি ব'লে 'তেলেনাপোতার মাছ কি বারবার ফাঁকি দিতে পারবে? তেলেনাপোতার মাছটি কে? অগাধ অতলজলের গভীরে হারিয়ে যাওয়া মাছ আর দীর্ঘদিনের বিস্মৃতির গভীরে ডুবে যাওয়া যামিনীর সঙ্গে তার কোন পার্থক্যই নেই। অথচ মাছও না যামিনীও না দুটির কোনটিই ধরা যাবে না—নয় ধরতে আপাতত ইচ্ছে নেই—এই নঞর্থক চিন্তার অস্ত্যর্থক পরিণতি কত সুন্দরভাবে ঘটেছে গল্পের মধ্যে। এবং এর মধ্যে লেখক প্রমাণ করিয়ে দিলেন যে একদল লোক এমনি ভাবেই পৃথিবীর ঘটনাগুলিকে তুচ্ছ করে দ্যাখেন সে নিরঞ্জনই হোন বা লেখকই হোন্। অথচ বৃদ্ধা মায়ের কাছে এটি কতবড় ঘটনা। সবটাই মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যর্থদীর্ণ ঘটনার অনুরণন।

দুই. এই পর্যবেক্ষণ রীতিটি আরো দৃঢ় হয়েছে গল্পের উপস্থাপনার বুনোটে। গল্পকার পাঠককে বলছেন। পাঠকও যেন গল্প শ্রোতার ভূমিকায় সব শুনে যাচ্ছেন। গল্পটি পড়ে মনে হবে যেন শুধুমাত্র পাঠককেই গল্পকার বলছেন। এবং পাঠকই যাবেন মাছ শিকারে—তিনিই এইসব অভিজ্ঞতার সাক্ষী হবেন এবং শেষে তিনি আবার অসুস্থ হয়ে নির্জন কোন স্থানে বসে ভাবলে এই সামান্য স্মৃতি অসামান্য রূপ নিয়ে তাকে দুলিয়ে দেবে। এই গল্প বলার টেকনিক তাই গল্পকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে এবং ইন্দ্রিয় সচেতন গল্পকারের দর্শন ঘ্রাণ—শ্রবণ এবং মন যে পরিপূর্ণ কাজ করেছে তাও বোঝা যায়।

তিন. গল্পের মধ্যে একটা যামিনীর হৃদয়ের যে বেদনা অব্যক্ত ছিল তা যেন আরো ঘনভাবে অব্যক্ত রইল লেখকের মিথ্যা—প্রতিভাষণের মধ্য-দিয়েই। এবং এই অব্যক্ত বেদনা পাঠক সমাজকে একটা মর্মান্তিক উপ-লব্ধিতে সাহায্য করলো। তেলেনাপোতা আবিষ্কারই মুখ্য ছিল, সেখানকার মাছ নয়, যামিনী নয়। অথচ একদিন না একদিন এই মাছ ধরা পড়বেই, যামিনীকে আনতে লেখক নিশ্চয়ই আবার তেলেনাপোতা যাবেন। তাহলে এই আবিষ্কারের অর্থ কি?

তেলেনাপোতা আবিষ্কার করার অর্থই যামিনীর মনের আকাশ আবিষ্কার করা। সেকাজ লেখক পেরেছেন তেলেনাপোতা থেকে ফিরে গিয়ে মনে মনে

নিজের সঙ্গে যখন নিজে কথোপকথন করছিলেন। নির্জনে একা একা যখন বসেছিলেন, স্মৃতিভারে তিনি পড়ে আছেন, তখন যাকে কেন্দ্র করে এই স্মৃতির রোমন্থন সে নেই।

এ সমস্তই লেখকের পর্যবেক্ষণ শক্তির ওপর নির্ভরশীল। মনের গভীরে লেখকের অনুপ্রবেশের ক্ষমতাই এই অন্তর্দৃষ্টি। যামিনী যে সব জানে বলেই সহজে লেখককে ছিপটা ফেলে যাচ্ছেন বলে স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেনি, সে তো ব্যথা পেয়ে পেয়ে পাথর হয়ে গিয়েছে এই বোধ লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয়। এবং তার ফলেই কল্পনা শক্তির সমৃদ্ধি দ্রুত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'Imagination and insight are infact inseparable' একথা প্রযোজ্য হয়ে পড়ে। এবং এখানেই সমগ্র গল্পের কাব্যধর্মিতা ভোরের আকাশে শুকতারার মতো জ্বলজ্বল করে ওঠে। অতি তুচ্ছ ঘটনাও তাই গভীরতর রূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

গ. রোম্যাণ্টিকতা :

রোম্যাণ্টিকতা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। দৈহিক ও অতিদৈহিক প্রেম, স্বপ্নময়তা, দূরচারিতা সবই রোম্যাণ্টিকতার উপাদান। ক্লাসিকতা হলো বাঁধাধরা পথে চলা, বিধিনিষেধ মানা। কিন্তু রোম্যাণ্টিকতা একটা উন্মাদমতা হৃদয়ের একটা প্রবলতম উচ্ছ্বাস—যা আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের মতো জমে থাকবে, ব্যথা, ক্ষোভ, আনন্দ উৎক্ষিপ্ত করবে—আবার তা সমুদ্রমন্থনও বটে —যাতে গরল এবং অমৃত দুই-ই উঠতে পারে। রোম্যাণ্টিকতার মধ্যে পরাবাস্তবতাও যেমন থাকতে পারে, তেমনি থাকতে পারে, নস্টালজিয়াও এ সবই আমাদের হৃদয়কে প্রস্ফুটিত করতে সাহায্য করে। কাব্যকলায় রবীন্দ্রনাথ এবং বোদলেয়ার ক্লাসিক এবং রোম্যাণ্টিক। গদ্য রচনায়ও এই দুটি ইজমু অলভ্য নয়। বিভূতিভূষণের প্রকৃতিকে ও মানুষকে ভালবাসা নিঃসন্দেহে রোম্যাণ্টিকতা, তারাশংকরেরও মানুষের দুঃখের প্রতি মমত্ববোধও রোম্যাণ্টিকতা। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় : 'রোমাণ্টিক বলতে আমি বুঝি—শুধু একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন নয়, মানুষের একটি মৌলিক, স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য চিত্তবৃত্তি। তারই নাম রোম্যাণ্টিকতা, যা ব্যক্তি-মানুষকে মুক্তি দান করে, স্বীকার করে নেয়—শুধু ইস্ত্রি করা এটিকেট মানা সামাজিক জীবটিকে নয়, নির্ভয়ে মানুষের অবিকল ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকে; তার মধ্যে যা কিছু অযৌক্তিক বা যুক্তির অতীত, অনিশ্চিত, অবৈধ, অন্ধকার ও রহস্যময় যা-কিছু গোপন পাপোন্মুখ ও অকথ্য যা-কিছু গোপন, ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয়—সেই বিশাল ও স্বতোবিরোধময় বিস্ময়ের সামনে, সন্দেহ

নেই, মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তির নামই রোম্যান্টিকতা। এই শক্তি, যা কোনো যুগেই একেবারে রুদ্ধ হ'য়ে থাকেনি কিন্তু কোনো—কোনো যুগে—যেমন শেক্সপীয়রের ইংলণ্ডে—যার বিস্ফোরণ গগনস্পর্শী হয়েছে, তা রুশোর পর থেকে সর্বসাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ হ'য়ে উঠলো। আরম্ভ হলো ঐতিহাসিক রোম্যান্টিকতা, বিশ্বসাহিত্যে বিরাট এক ঘটনা, যা মানুষের চিন্তার পরতে পরতে এমন ভাবে প্রবেশ করেছে যে আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি যে সমগ্র আধুনিক সাহিত্যই রোম্যান্টিক। এলিয়ট অথবা ভালেরির মতো যাঁরা প্রকরণে বা মতবাদে ক্লাসিক ধর্মী তাঁদেরও ভাষা ব্যবহার পরীক্ষা করলেই রোম্যান্টিক বেরিয়ে আসে।[৫] এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির মধ্যে এটা স্পষ্ট হোল যে রোম্যান্টিকতা শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা নবজাত আন্দোলন। ভাষা, আঙ্গিক, রীতির মধ্যে থেকেও ভাবে ব্যঞ্জনায় নবতর রূপমাধুরী নিতে পারে কোন রচনা বা রেখায় রঙে কোনো শিল্প অপরদিকে রীতি না মেনে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে কোনো শিল্প বা সাহিত্য নিবেদিত হলে তাকে নিশ্চয়ই রোম্যান্টিক বলা যাবে। তেলেনাপোতার প্রেম 'তাসের দেশ'-এর নাম না-জানা কোনো প্রিয়ার প্রেম। একে নির্বিশেষ প্রেম বলা চলে যদিও যামিনীর নাম লেখকের জানা, যদিও ব্যথাহীনতার গণ্ডীতে বুদ্ধাকে বেঁধে না রেখে ছলনার আবর্তে তাঁকে নিমজ্জন করার একটা সূক্ষ্ম পরিকল্পনা আছে—এবং কোন এক নিরালা নিঝুম স্থানে বসে অতীত স্মৃতিচারণের সুখে লালিত লেখকের দোষ খুব বেশী করে ধরা পড়ে না পাঠকবর্গের কাছে

যামিনী তো বাস্তবে প্রায় বিগতযৌবনা একটি নারী। সে জানে যে যারা তার মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে তারা কেউ-ই তার পাণিগ্রহণ করবে না, তবুও তার ব্যবহারে কোন দৈন্য নেই, কোন হাহুতাশ নেই। তাই গল্পের অন্তরে এই বিশেষ নারীর প্রেম নির্বিশেষ হয়ে দেখা দেয়।

যেমন, অনেক রাতে ছাদে একটি জানালার ধারে একটি ক্ষীণ আলোক রেখা আড়াল করে একটি রহস্যময় ছায়ামূর্তির অবস্থান দেখা যাবে আবার কিছুক্ষণ পরে তাকে দেখাও যাবে না। মনে হবে মনের ভ্রম। কেন এই বাতায়নবর্তিনীর এত গভীর নিশীথেও ঘুম নেই এ চিন্তায় লেখক উদ্বেল হলেও তাঁর মনের ক্যানভাসে কোন রেখাপাত হয়নি।

তারপর লেখক যখন ঘাটের ধারে ছিপ নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে মাছ ধরার আশায় বসে থাকবেন, তখন জলের শব্দে ফাৎনা নড়ার সঙ্গে লেখক তাকিয়ে দেখবেন এক কৈশোর-যৌবনের মাঝামাঝি কোন এক নারীকে মুখ ফিরিয়ে একঘড়া জল তুলে নিতে। সে মেয়েটি বলবে বসে আছেন কেন? টান দিন।'

মেয়েটির বয়স বোঝা যায় না। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর একটি কবিতায় লিখেছিলেন :

> 'সে পুরুষ কি নারী
> কেউ যেন জানতে না চায়,
> জানতে না চায় কি তার বয়স।
> সে সময়ের অতীত, যৌনতার উর্ধ্বে।
> তার অন্ধকার'ও না-এর শূন্যতা নয়,
> নীহারিকাগর্ভ এক রহস্যনিবিড়তা।'
>
> [এক আকাশ অন্ধকার / 'নদীর নিকটে']

সুতরাং এই যামিনীর বয়সের মধ্যেও যে দোলা আছে তাতে একদিকে দারিদ্র্যের দহন যেমন আছে, তেমনি অন্যদিকে আছে উপেক্ষা আর প্রতীক্ষার জ্বালা। এসবই মিলিয়ে একটি রোম্যান্টিক পরিবেশ তৈরী। অপরিচিতা এই নারীর ব্যবহারে লেখক বিহ্বল তাই ছিপে টান দিতে তিনি ভুলে যান। অথচ তারপর সেই মেয়েটি আর লেখকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে বাক্যালাপ করতে না চেয়ে হাসির ঝিলিক টেনে চলে যায়।

শেষ মুহূর্তে চলে আসার সময় গাড়ীর কাছে এসে যামিনী সকরুণ নেত্রে লেখকের ফেলে-আসা ছিপটা কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যে শান্ত সুমধুর ব্যবহার দেখালো তাতেও একটি রোমান্টিক চিত্র প্রতিভাত হয়েছে। লেখক বলেছেন, ছিপটা থাকনা, এবার ছিপে মাছ ধরতে না পারলেও তেলেনা-পোতায় মাছ কি বার বার ফাঁকি দিতে পারবে। এই কথার মধ্যে বারবার আসবার অঙ্গীকার যেন ঝরে পড়ছে তাতে যামিনীর চোখে-মুখে যে কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটে উঠেছে—সেই হাসিটুকুই এই গল্পের সার্থক রোম্যান্টিকতার খণ্ডচিত্র। সব মিলিয়ে একটি পূর্ণ চিত্রে যে রোম্যান্টিকতা প্রতিভাত হয়ে উঠেছে তা কিন্তু ঠিক বাস্তব বলে মনে হয় না। মনে হয় দৃশ্যমান বস্তুর ভেতর দিয়ে একটা অনির্দেশ্য জগতে উপনীত হওয়া। এই হোল মহান রোম্যান্টিকদের কাজ। 'The great Romantics then agreed that their task was to find through imagination some transcendental order which explains the world of apperances and accounts not merely for the existence of visible things but for the effect which they have on us, for the sudden, unpredictable beating of the heart in the presence of beauty, for the Conviction that what then moves us canot be a cheat or an illusion but must derive its authority from the power

which moves the universe.' [Romantic Imagination C. M. Bowra Page 22] তেলেনাপোতায় কবি গল্পকার যা আবিষ্কার করতে চেয়েছেন তা 'some transendental order' তো নিশ্চয়ই এবং তার মধ্য দিয়ে 'world of appearance' এর ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। অন্যদিকে unpredictable beating of the heart in the presence of beauty খুঁজে পাওয়া যায় যখন কবি—গল্পকার নির্জনে বসে বসে স্মৃতিচারণা করেন, তখনই এর রোমান্টিকতার বিমূর্তরূপ [যদিও আপাত চক্ষে তা মূর্ত] ধরা পড়ে।

সবশেষে গল্পকথন ভঙ্গিতে রোম্যান্টিকতা উল্লেখের দাবী রাখে। বাংলা-সাহিত্যে তখনও পর্যন্ত কেন তারপরেও এ ধরনের গল্পকথন ভঙ্গি লেখা যায় নি। ভবিষ্যৎকাল ব্যবহার করে পাঠককে 'আপনি' সম্বোধনে সম্বোধিত করে গল্পকার দুলকি চালে গল্প বলে চলেন বলেই নিঃসন্দেহে তার মধ্যে একটা নবতর চেতনার উন্মেষ ঘটে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের অন্যান্য রোম্যান্টিক গল্পগুলি বা উপন্যাসগুলির মধ্যে তাঁর প্রেম-চেতনার যে লেখাচিত্রগুলি পাওয়া যায় তাতে একদিকে যেমন ছিল কল্লোলীয় বাস্তবতা তেমনি রাবীন্দ্রিক রোমান্টিকতা। কল্লোলের দেহ-সাপেক্ষ প্রেম তিনি উপেক্ষা করেন নি, অন্যদিকে রাবীন্দ্রিক প্রেম-পরিমণ্ডল বিমূর্ত প্রেমের জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। তাই তিনি বলতে পেরেছেন :

> 'এ বিস্বাদ জীবনের বিষপাত্রখানি
> ওষ্ঠে তুলি ধরি,
> নিঃশেষিয়া যাব পান করি,
> শুধু তার সযতন অনুরাগ স্মরি
> জীবন-শিয়রে বসি দোলা দেয় যে স্বপ্নসুন্দরী'

তবে এরকম কবিতা প্রেমেন্দ্রের বড় বেশী নেই। তা হলেও বস্তুগত ও ভাবগত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে এক অপূর্ব জগতে অভিযান করার মানসিকতা যা রোম্যান্টিকতার ধর্ম, সে বোধ এবং বোধি প্রেমেন্দ্রের রোমান্টিকতায় আছে। রোম্যান্টিকতার সংজ্ঞা যদি বিস্ময় বোধ এবং অপ্রাপ-নীয়কে পাওয়ার জন্য স্বপ্নসুষমা এবং মনোরাজ্যে একটি অনির্বচনীয় মাধুরী সৃজন করা হয় তাহলে তারাশংকরের নিছক ইন্দ্রিয় নির্ভর অতিক্রম্য প্রেম বা বিভূতিভূষণের নিসর্গ ও মানবমনের কখনো আত্মগত কখনো তন্ময়গত প্রেমের পাশে প্রেমেন্দ্রের এই অধরাকে ধরার স্বপ্ন যে বিচিত্র রোম্যান্টিকতার

রূপে তা একবাক্যে বলা চলে। তাঁরই একটি কবিতার উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ

'হাত দিয়ে হাত ছুঁই
কথা দিয়ে মন হাতড়াই,
তবু কারে কতটুকু পাই।
সবকথা হেরে গেলে
তাই এক দীর্ঘশ্বাস বয়।
বুঝি ভুলে কেঁপে ওঠে
একবার নির্লিপ্ত সময়' [কথা / 'ফেরারী ফৌজ']

প্রসঙ্গত সমকালীন কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পরাজিতে রোম্যান্টিকতা আলোচনা করা প্রয়োজন।

বিভূতিভূষণের কোন কোন গল্পে বস্তুনিষ্ঠ রোম্যান্টিকতার স্বাদ মেলে। এমনই একটি গল্পের শিরোনাম 'রোমান্স'। এ গল্পের শ্রোতা সমীর বলেছে 'এই যে রোমান্স-প্রেম ও-সব নভেলিয়ানা কেবল নভেলেই ঘটে, বাস্তব জীবনে ওদের অস্তিত্বই নেই, অথচ গল্পের শুরুতেই কথক অর্থাৎ রমেনবাবু বলেছেন, 'রোমান্স আছে এবং খুবই আছে। জীবনটাই তো একটা প্রকাণ্ড রোমান্স হে-সে চোখে দেখে কজন—দেখবার চোখটাই বা আছে কজনের?' প্রতিমা রমেনের জন্যেই মানসিক রোগী হয়ে মৃত্যুবরণ করে নিয়েছে। মনে মনে রমেনকে যে প্রতিমা ভালোবাসে তা ছোটবোন বীণাকে বিবাহ করার পরও আবিষ্কৃত হোল না। এ গল্পে রমেন বীণাকে তার বাড়ীতে যাওয়ার কথা দিলেও ঢাকায় আর যাওয়া হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই বীণাই তার স্ত্রী হিসেবে দেখা দিয়েছে। এমনি যামিনীর মতো অপেক্ষা করে থাকার উদাহরণ 'সুলোচনার কাহিনী'তে ফুটে উঠেছে। সুলোচনার দেহসজ্জা এবং ব্যবহার সবই রহস্যাবৃত হলেও সে মনে মনে ভালোবাসতো বিপ্লবী প্রকাশকে। সে জানতো প্রকাশ একদিন আসবেই। যামিনীর প্রেম নির্বিশেষ, কিন্তু সুলোচনার প্রেম বিশেষ রূপেই চিহ্নিত। প্রকাশ কখনোই আসেনি।

'উমারাণী' একটি গল্প যেখানে ভগিনী শৈলর মৃত্যুর পর উমাকে সতীশ নিজের ভগিনীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু সেখানে কথা দিয়েও বোনের কাছে উপস্থিত হতে পারেনি সতীশ। এই রোম্যান্টিকতার মধ্যে আছে স্নেহ এবং বিচ্ছেদ বেদনা দুইই।

বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা'। এখানেও রোম্যাণ্টিকতার একটি রূপ প্রতিভাত। বিমল ইস্কুল যাওয়ার পথে যে গ্রাম্য বধূকে দিদির মতো সম্মান করেছে সেই দিদিও ছোট ভাই-এর মতো বিমলকে হৃদয়ের মণি-কোঠায় স্থাপন করেছে অথচ সেই বিমল দিদিকে না জানিয়ে চাকরী ছেড়ে চলে গেল। এখানেও সেই একটি সুরই প্রাধান্য লাভ করেছে যা 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পে মূর্ত'। বিমল বিদেশে চাকরী নিয়ে যাওয়াতে দিদির বুকে বিচ্ছেদ ব্যথা তীব্রতর হবে এই আশংকাতেই বিমল দিদিকে না জানিয়ে চলে যায়। মানুষের মনে আঘাত না দেওয়ার প্রবণতা বাস্তব সত্য।

তারপর অতীত ও ভবিষ্যতের সুখস্মৃতি দিয়ে অনেকেই বর্তমানের জ্বালা ভুলে থাকতে চায়। 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পে বৃদ্ধার রঙীন স্বপ্নকে কেউই নষ্ট করতে চায় না। তেমনি বিভূতিভূষণের একটি গল্প 'বেচারী' যেখানে একটি বেকার যুবক সুরেশ তার দিদির বাড়ী একটি গণ্ডগ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষকে জানায় যে সে ম্যাট্রিক পাশ আর যে কোন মুহূর্তে সে যে কোন চাকরী পেতে পারে কারণ তার সঙ্গে বহু বড় বড় লোকের, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিচয়। অথচ এমনি অদৃষ্টের পরিহাস যে তাকে তার দিদির বাড়ীর বাজার করা থেকে শুরু করে সংসারের সব কাজই করতে হয়। প্রসঙ্গত অন্য একটি গল্প 'নাস্তিক' আলোচনা করলে দেখা যাবে সেখানেও লোকনাথ বর্তমানকে উপেক্ষা করে পরিদৃশ্যমান জগতকে মায়া মনে করে যৌবনবতী মায়াকে ত্যাগ করেছে এবং আত্ম-প্রতারণাই করেছে। এর ফলে তার চৈতন্য-সত্তার স্বরূপ আবৃত থেকেছে। কিন্তু জ্ঞান এলো তার শেষ সময়ে। এখানেই 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের মূল সাদৃশ্য ধরা পড়ে।

এই প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণের মতো তারাশংকরের গল্পে যে ধরনের রোম্যাণ্টিকতা আছে তা আলোচনা করলে দেখা যায় তাঁর বহু গল্পে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর প্রেম। কিন্তু 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের মূল সুর প্রতীক্ষায়। অনন্ত প্রতীক্ষা। 'কল্লোল' [ফাল্গুন, ১৩৩৪]- এ প্রকাশিত তারাশংকরের 'রসকলি' গল্পে এই সুর ধরা পড়ে।

পুলিন মঞ্জুরীকে ভালোবাসত, আর মঞ্জুরীও পুলিনকে ভালোবাসত। কিন্তু এই পুলিন যখন তার কাকা রামদাসের আদেশে গোপিনীকে বিবাহ করলো তখনই গল্প নতুন মোড় নিলে। মঞ্জুরী ও পুলিন 'রসকলি' পাতিয়েছে তার কাকা রামদাসও মৃত্যুর সময় জমিজমা গোপিনীর নামেই লিখে দিলো। গ্রাম্য অপবাদ তীব্র হয়ে উঠলেও পুলিন কিন্তু ভেঙে

পড়েনি। জমিদার জমির নাম খারিজের সময় পুলিনের ওপর হুকুমনামা জারি করেন যে, মঞ্জুরীকে ত্যাগ করতে হবে। পুলিন এর প্রতিবাদ করে। কিন্তু গল্পের শেষ পর্যায়ে দেখা যায় মঞ্জুরী পুলিন-গোপিনীর মিলন ঘটিয়ে বৃন্দাবন চলে যায়। মঞ্জুরী গোপিনীকে ফিরে আসার কথা দেয়। কিন্তু মঞ্জুরী কি কোনদিন ফিরে আসবে?

অন্য একটি গল্প 'সাবিত্রী চুড়ি' যাতে ঐ প্রতীক্ষার ছবি উদ্ঘাটিত। গোবিন্দের পিওনের চাকরীটি কোনদিনই পাওয়া হোল না। তাই লক্ষ্মীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে বাঁধা পড়া তারপক্ষে সম্ভব হোল না। গোবিন্দ যে কী প্রতীক্ষায় ছিল, চাকরীটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় সেই প্রতীক্ষা অনন্ত বিরহ বেদনার বাঁশি বাজিয়ে দেয়।

এমনই একটি গল্প 'সন্ধ্যামণি'। বাউণ্ডুলে কেনারাম তিন বছরের মেয়ে সন্ধ্যামণিকে হারিয়ে শ্মশানঘাটের পাশে একটি সন্ধ্যামণি ফুলের গাছ লাগিয়েছিল। সন্ধ্যামণি ফুলের ফুটন্ত রূপ দেখলেই তার মনে একটি আশার সঞ্চার হয় যে, সে আসবে। কিন্তু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া সন্ধ্যামণি যে আর কোনদিন ফিরে আসতে পারে না একথা ধ্রুব সত্য। 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের নিরঞ্জন বা লেখকের কোনদিন না-আসা যে শাশ্বত সত্য একথা গল্পের শেষ পর্যায়ে পাঠক সাধারণ বুঝতে পেরেছেন।

তেলেনাপোতায় যে নির্বিশেষ প্রেম আছে তারাশংকরের গল্পে তা নেই। অবশ্য তারাশংকরের গল্পে রোম্যান্টিকতার মধ্যে ত্যাগ ও বঞ্চনা পাশাপাশি বিরাজ করেছে। 'রাইকমল' গল্পে কমলিনী রঞ্জনকে ভালোবাসলেও কমলিনীর মা কমলিনীকে নবদ্বীপ নিয়ে গিয়ে এক আধ-বুড়ো বৈষ্ণব রসিকের সঙ্গে বিবাহ দেয়। রসিক কমলিনীর জৈবিক ক্ষুধা নিবৃত্তিতে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করে। শেষ পর্যন্ত কমলিনী এই ব্যর্থতার আবরণ ছিঁড়ে ফেলতে রসিকের সমাধিতলে মাথাকুটে আপনমনে গান গায় আর আত্ম-নিবেদন করে। না পাওয়ার ব্যথা ও ত্যাগ-সিঞ্চিত রোম্যান্টিকতা এই গল্পে দ্যোতনালাভ করেছে।

তারাশংকরের রোম্যান্টিকতার মধ্যে বেদনা-রস-সিঞ্চিত একটি হৃদয় আছে, সে হৃদয় দুহাতে নিজেকে বিলিয়ে দিতে জানে। স্বার্থ-শূন্য একটা নিটোল প্রেম। 'মালা চন্দন' গল্পে দেখা যায় বালিকা বয়সে বিধবা যে তুলসী হাজার অনুরোধেও বিবাহ বন্ধনে নিজেকে বাঁধে নি, সেই কেঁদুলীর পথে মোহনদাস মোহান্তের সঙ্গে মালাচন্দন পরে তার ঘরে গিয়ে দেখলো যে তার একটি মুমূর্ষু স্ত্রী আছে। সেই প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পরও আট বছর সংসার-জীবন অতিক্রান্ত করে মোহান্ত যখন আবার কোন রূপসীকে ধরে

নিয়ে আসে তুলসী তখন বৈষ্ণবীয় প্রবাদ 'ছিঁড়লে মালা গাঁথিতে আছে নতুন করে' ব্যর্থ করে অনন্তপথের যাত্রিনী হয়ে যায়। বুকে ব্যথা মুখে কীর্তন। এই যে যন্ত্রণাসিক্ত রোম্যান্টিকতা এখানে তারাশংকর একান্তভাবেই সার্থক। 'উল্কা' গল্পে বিমলাকে ছেড়ে জ্যোতি যে নীলাকে পেয়েছে সেই নীলা তার রোগে সেবা করেছে। বিমলাও সমস্ত অন্তর দিয়ে জ্যোতিকে গ্রহণ করতে পারে নি অথচ নীলা জ্যোতির আন্তর-আকাশ চিনতে পেরেছিল বলেই প্রেমের পাওয়া-না-পাওয়ার যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে সুন্দরভাবেই। তারাশংকরের রোম্যান্টিক মন 'শবরী' গল্পে নতুন মোড় নিয়েছে। ফণি দীর্ঘদিন জেলে থেকে আবার কোথায় চলে গেল কেউ জানে না। বিধবা পিসি সরলা তার প্রতীক্ষায় দিন গোনে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর সরলা আজ ভিখারিণী। স্নেহ-কাতর সরলা ভেবেছে যে ফণিকে হারিয়ে সে কাঙালিনী হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে প্রেমেন্দ্রর 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের বৃদ্ধার প্রতীক্ষাই একমাত্র তুলনীয় হতে পারে।

এই গল্পের রোম্যান্টিকতার মধ্যে যে নস্টালজিয়া আছে তা রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিলে পূর্ণ হয়ে উঠবে, যদিও সেখানে স্মৃতি-রোমন্থন করার জন্য একদা প্রণয়ীর কাতর আবেদন আছে। কিন্তু লেখকের স্বগতোক্তি—'কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে,

বসন্ত বাতাসে
অতীতের তীর হতে যে-রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ ;
সেইক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে রহিল যে
তোমার প্রাণের প্রান্তে ; বিস্মৃত প্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মুরতি।' [বিদায় / 'মহুয়া']

'শেষের কবিতা'র লাবণ্য যখন অমিতের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, তখন তার প্রেমের মৃত্যুঞ্জয় রূপটি অনুধাবনের জন্য একটি কবিতার মাধ্যমে চিঠির অপর পিঠে জানিয়েছিল। এখানেও লেখক পাঠকবর্গকে জানিয়েছেন যে কোনদিন পূর্ণ অবকাশে একান্তে বসলে তেলেনাপোতার সেই স্মৃতি মনে জাগতে পারে। তা হয়ত 'একটা স্বপ্ন বলে মনে হবে।' কিন্তু সেই স্বপ্নই প্রেমের প্রতিভাস হয়ে দেখা দেয়। লাবণ্য এই স্বপ্নিল প্রেম অমিতের উদ্দেশ্যে রেখেছিল। কিন্তু এখানে যামিনীর প্রেম অলীক কল্পনা হলেও তার 'গম্ভীর কঠিন' মুখ আর 'সুদূর করুণ' দৃষ্টি প্রেমের প্রতীক হিসেবে দেখা দিয়েছে।

ঘ কথন ভঙ্গি :

কথন শৈলীর অভিনবত্ব শিল্পরীতির অভিনবত্বে মিলে মিশে গল্পটিকে এক নবতর মহিমায় উন্নীত করেছে। প্রথমত গল্পটি উত্তম পুরুষে বলা হয়েছে। গল্পকার নিজে যে গল্পের নায়ক সেকথা উপলব্ধি করা যায় কিন্তু গল্প বলার টেকনিকে 'আপনি' কখন যে পাঠক হয়ে যান তা বুঝতে বুঝতে পাঠক সেই গল্পের নায়কে পরিণত হয়ে যান। বাংলা গল্পের ধারায় এমনি ভবিষ্যৎকালের প্রয়োগ আর 'আপনি' শব্দ ব্যবহার করে গল্প এত গতিশীল হতে পারে তা এই গল্পই প্রমাণ করেছে। এ যেন কোন বিশেষ গল্প নয়, কলকাতা থেকে ত্রিরিশ মাইল দূরে কোন গ্রামের এভাবে অস্তিত্ব থাকতে পারে আর যে কোন মানুষ অর্থাৎ আপনিও গিয়ে সেখানে এমনি একটি চিরন্তন পরিবেশের মুখোমুখি হতে পারেন। সুতরাং সবচেয়ে উল্লেখ্য বিষয় হলো এর কথন-ভঙ্গি।

ঙ. ভাষা :

এ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্-এর ভাষারীতির মধ্যে ভাষাকে ভাগ করা হয়েছে বর্ণ, শব্দাংশ, অন্বয়ীশব্দ, বিশেষ্য, ক্রিয়া, বিভক্তি, কারক, বাক্য অথবা বাক্যাংশ পর্য্যায়ে। এই ভাষার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে শব্দ, ক্রিয়াপদের এবং কর্তার ব্যবহার, উল্লেখযোগ্য। বর্তমানকাল এবং ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদের যথেচ্ছ নিদর্শন যেমন গল্পটির গঠন-নৈপুণ্যে মুন্সিয়ানা ফুটিয়ে তুলেছে, তেমনি বৈচিত্র্যময় শব্দ সম্ভারও। ভাষার মধ্যে কখনো গ্রাম্য চটুল, কখনো তৎসম শব্দ প্রাধান্য থাকার ফলে সমগ্র গল্পটির প্রতীতি স্থাপনে যথেষ্ট সুযোগ এসেছে। তাছাড়া গল্পের শব্দ-প্রত্যয়ে কাব্য-রস-সুষমা থাকায় গল্পটি পাঠে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি আসে না। যেমন : 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার করতে হ'লে একদিন বিকেলবেলার পড়ন্ত রোদে জিনিষে মানুষে ঠাসাঠাসি একটা বাসে গিয়ে আপনাকে উঠতে হবে, তারপর রাস্তার ঝাঁকানির সঙ্গে মানুষের গুঁতো খেতে খেতে ভাদ্রের গরমে ঘামে, ধুলোয় চটচটে শরীর নিয়ে ঘন্টা দুয়েক বাদে রাস্তার মাঝখানে নেমে পড়তে হবে আচমকা।' এখানে 'পড়ন্ত রোদে', 'জিনিষে মানুষে ঠাসাঠাসি' 'ঝাঁকানির সঙ্গে মানুষের গুঁতো খেতে খেতে' 'গরমে ঘামে ধুলোয় চটচটে' শব্দ ব্যবহারে চলিত রীতির মৌখিক রূপের ব্যবহার বেশী দেখা যাচ্ছে। তেমনি 'গুঁতো' শব্দে শিংওয়ালা কোন প্রাণী অর্থাৎ ষাঁড় বা গরুর ইমেজও ফুটে উঠেছে। এতে খারাপ শোনালেও বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। তাছাড়া তৎসম শব্দ, ভারী শব্দ ও হাল্কা শব্দ ব্যবহারও করেছেন প্রয়োজনবোধে। যেমন, 'সেখান থেকে

অপরূপ একটি শ্রুতি বিস্ময়কর আওয়াজ পাবেন।' এখানে 'শ্রুতি বিস্ময়কর' তৎসম শব্দের পাশে 'আওয়াজ' এই ফারসী শব্দ বসে ভাষার লাবণ্য বৃদ্ধি করেছে। এরকম অনেক বাক্য আছে যাতে চলিত ভাষার রকমফের বা স্টাইল ধরা যায়।

কথন শৈলীতে শব্দ মোল বিষয়। গল্পকার যেমনটি যেখানে দরকার তেমন শব্দই ব্যবহার করেছেন। যেন শব্দবিম্ব—অসংখ্য আছে। 'গুঁতো খেতে খেতে', 'ধীরে ধীরে', 'বড়ো বড়ো', 'মাঝে মাঝে', 'পায়ে পায়ে', 'ছড়িয়ে ছড়িয়ে', 'থেকে থেকে', 'ক্ষণে ক্ষণে', 'শুনতে শুনতে', শব্দগুলি বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছে। শব্দ ছাড়া উপমা, চিত্রকল্প অলংকারও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

'উপমা' ব্যবহারও গল্পটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। যেমন,

১. মনের আকাশে একটু ক'রে কুয়াশা জমছে কিনা আপনি টের পাবেন না।

২. বুঝতে পারবেন চারিধারের গাঢ় অন্ধকারে চেতনার শেষ অন্তরীপটিও নিমজ্জিত হয়ে গেছে।

৩. স্বপ্নের বুদবুদ ক্ষণিকের জন্য জীবনের জগতে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গেছে।

এখানে মনের আকাশ, চেতনার শেষ অন্তরীপ, এবং স্বপ্নের বুদবুদ উপমা যুক্ত শব্দগুলির ব্যবহার লক্ষণীয়। এছাড়া আরো কতকগুলো বাক্য তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে ঃ যেমন

১. রাত্রির মায়াবরণ স'রে গিয়ে তার নগ্ন ধ্বংসমূর্তি এত কুৎসিত হ'য়ে উঠতে পারে আপনি ভাবতে পারেন নি।

২. মনে হবে সেই শূন্য কোটরের ভেতর থেকে অন্ধকারের দুটি কালো শিখা বেরিয়ে এসে যেন আপনি সর্বাঙ্গ লেহন ক'রে পরীক্ষা করছে।

৩. আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত ক্ষয়িত চাঁদ বোধ হয় উঠে এসেছে।

৪. একটা কটু গন্ধ অনেকক্ষণ ধ'রেই আপনাদের অভ্যর্থনা করছে। বুঝতে পারবেন সেটা পুকুরের পানা পচা গন্ধ।

৫. তারই পাশে বেশ বিশালয়াতন একটি জীর্ণ অট্টালিকা, ভাঙা ছাদ, ধসে পড়া দেয়াল ও চক্ষুহীন কোটরের মত পাল্লাহীন জানালা নিয়ে চাঁদের বিরুদ্ধে দুর্গ প্রাকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

এই বাক্যগুলিতে সমাসোক্তি অলংকার তৎসম শব্দের পাশে গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার লক্ষণীয় রূপ নিয়েছে। চক্ষুহীন কোটরের সঙ্গে পাল্লাহীন

জানালার সঙ্গে উপমিত হয়ে এক ক্ষয়িষ্ণু অট্টালিকার চিত্ররূপ প্রকাশমান করে তুলেছে। ক্ষয়িত, এজ্রে, খেদানো, 'মিছিমিছি'র জীর্ণ কন্থা জড়িত, ক্রুর কুণ্ডলিত জলীয় অভিশাপ, বিস্মৃতি বিলীন প্রান্ত প্রভৃতি শব্দ জ্বলজ্বল করছে। অর্থাৎ ভাব প্রকাশে যখন যে শব্দ প্রয়োজন সেই শব্দই গল্পকার ব্যবহার করেছেন।

ক্রিয়া পদের ব্যবহার লক্ষণীয় ঃ

১. শনি ও মঙ্গলের—মঙ্গলই হবে বোধ হয়- যোগাযোগ হ'লে তেলেনা-পোতা আপনারাও একদিন আবিষ্কার করতে পারেন।

২. বড়ো রাস্তা থেকে নেমে সেই ভিজে জলার কাছেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে আপনাকে।

৩. মনে হবে মঙ্গল থেকে এক যেন অমানুষিক এক কান্না নিংড়ে নিংড়ে বার করছে।

৪. দু-তিনটি চামচিকা ঘরের অধিকার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে সমস্ত রাত বিবাদ করবে।

৫. বেলা বাড়বে।

৬. তক্তাপোশের একপাশে যামিনী পাথরের মূর্তি মতো দাঁড়িয়ে।

৭. একবার ক্ষণিকের জন্যে আবিষ্কৃত হ'য়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যাবে।

বেশীর ভাগ বাক্যই ভবিষ্যৎকালের। এবং ভবিষৎ অনুজ্ঞার।

সামান্য কিছু বর্তমান এবং 'পারেন' এই ক্রিয়াপদে ভবিষ্যতের একটি বিশেষ রূপ প্রকাশমান। আবার অনেক বাক্যের আদিতে 'মনে হবে' এই শব্দ দুটির প্রয়োগেই গল্পটিকে একদিকে বাস্তবতার অন্তরালে কল্পনাশ্রয়ী করে তুলেছে। শুধু তাই নয় সুররিয়েলিজম, এসকেপিজম ও নস্টালজিয়ার প্রকাশ মাধ্যম হিসাবে বাক্যও সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ।

চ. চরিত্র ও রসসৃষ্টি ঃ

তেলেনাপোতার ঘটনা সামান্যই। লেখক তাঁর দুজন বন্ধু নিয়ে কলকাতা থেকে দক্ষিণে সামান্য কিছু দূরে সপ্তাহের ছুটির একটি দিনে ক্লান্তি অপনোদন ও মাছ ধরার জন্যই যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। এই বন্ধুদের একজনের দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের জীর্ণ একটি বাড়ীতে রাত্রি যাপন। সেখানে এই আত্মীয়ের একটি মেয়েকে দেখা-না-দেখার মধ্যে যে

রোম্যাণ্টিকতা ধরা পড়ে, তার সঙ্গে তার বেদনার আভাসও পাঠক সমাজ জানতে পারে। এই বেদনার কারণ যে কোন পুরুষের প্রবঞ্চনা সম্বন্ধ তা আরো দৃঢ় হয়ে দেখা দেয় লেখকের মিথ্যা অভিনয়ের মধ্যে। তখনই গল্পটি ঋদ্ধ হয়ে ওঠে। বাস্তবিকভাবে নিম্ন মধ্যবিত্ত একটি ঘরের যৌবন উত্তীর্ণা কোন যুবতীর বিবাহের জন্য বিধবা মাতা যেমন অধীরা হয়ে ওঠেন, তেমনি সেই যুবতীও। কিন্তু মাতা যদি রুগ্না হন, দৃষ্টিশক্তি তাঁর যদি আদৌ না থাকে এবং সেই সঙ্গে তিনি যদি বুঝতে না পারেন যে কোন ছেলে তার মেয়েকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়ে আর এ-পথে আসবে না, এবং যখন মেয়েটিও বুঝতে পারে যে এভাবে ছেলেরা শুধুমাত্র ছলনা করে চলে যায়, কেউই তার জন্যে বসে নেই তখনই ট্রাজিডিটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গল্পকার এই ট্রাজিডির লক্ষ্যে পেঁছানোর জন্য যে চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছেন সেগুলি রসাভাস-দোষের কারণ তো হয়নি, বরং রস-সৃষ্টিতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। যেমন লেখকের পানরসিক সঙ্গী মণিদার কাজ।

ক. যামিনীর বৃদ্ধা মা

যামিনীর বৃদ্ধা অন্ধ মা ভাবেন যে-ই তার বাড়ীতে আসে সেই নিরঞ্জন। তার দূর সম্পর্কের বোনের ছেলে নিরঞ্জন একবার এসে কথা দিয়ে গিয়েছিল যে সে বিদেশ থেকে ফিরে এসে যামিনীকে বিয়ে করবে। তার আগমনের আশায় বৃদ্ধা বুক বেঁধে অপেক্ষা করছে। বৃদ্ধা তার মেয়ে যামিনীর সম্পর্কে এত বেশী আশাবাদিনী যে তার মেয়ে যামিনীর মতো মেয়ের তুলনা হয় না। বৃদ্ধা বলেছে, 'যামিনীকে নিয়ে তুই সুখী হবি বাবা। আমার পেটে হয়েছে ব'লে বলছি না, এমন মেয়ে হয় না। শোকে তাপে বুড়ো হ'য়ে মাথার ঠিক নেই, রাতদিন খিট খিট ক'রে মেয়েটাকে কত যন্ত্রণা দিই— তা কি আমি জানি না। ..... এরই মধ্যে একাধারে মেয়ে পুরুষ হ'য়ে ও কি না করছে।' যামিনীকে স্নেহ করে মা কিন্তু সেই স্নেহ ছাপিয়ে তার কর্তব্য নিষ্ঠা তার আরো বিশ্বাস আনিয়েছে। বৃদ্ধা যে কোন পদশব্দে অনুমান করতে পারে, 'আমি জানতাম তুই না এসে পারবি না বাবা। তাই তো এমন ক'রে এই প্রেতপুরী— পাহারা দিয়ে দিন গুনছি।'

বৃদ্ধার আন্তরিকতায় প্রতিটি অপরিচিত মানুষ মুগ্ধ হয়ে যায়। সত্যকথা বলে তার মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করতে কেউই আর চায় না। বৃদ্ধা সজ্ঞানে কন্যাকে যন্ত্রণা দেয়— কারণ তার বয়সের ধর্মই তাই। আর দেখা যায় প্রেতপুরী পাহারা দিয়ে বসে আছে সে মেয়েটির জন্যই।

খ. যামিনী

সমগ্র গল্পে যামিনী সামান্য কটি কথা বলেছে কিন্তু সে-ই গল্পের কেন্দ্রবিন্দু। বিগত যৌবনা নারী কখনো কখনো যৌবনবতীর ভূমিকা নিতে পারে। যামিনী সেই ভূমিকাই নিয়েছে। প্রথমত ছাদে তাকে দেখে লেখকের রোম্যান্টিক মনে দোলন লেগেছে। তারপর ছিপে টান দেবার কথা বলা, কলসী কাঁখে জল নিয়ে আসার মধ্যে যামিনী-যৌবন ছন্দ সৃষ্টি করেছে—যা পুরুষকে সামান্য ক্ষণের জন্য হলেও আকর্ষণ করতে পেরেছে। কিন্তু বাস্তবিকভাবে সে কোন পুরুষকেই তার যৌবন-পুষ্ট রূপ-লাবণ্য দেখিয়ে কাছে টেনে আনতে পারেনি—না লেখককে না নিরঞ্জনকে। সকলে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েও ফিরে আসেনি। যামিনী অবশ্য জানে যে কেউ-ই ফিরে আসবে না। তাই লেখক ছিপটা ফেলে আসার সময় সে বলেছে, "আপনার ছিপটিপ যে পড়ে রইল।" কেউ-ই তার মুখের ওপর অপ্রিয় সত্যকথা বলতে সাহস করেনি। তাই লেখকও বলেছে যখন যে সে ফিরে আসবে তখন সে চোখের হাসি হেসেছে তা আদৌ মুখের নয়। সে হাসির অন্তরালে করুণা ছাড়া আর কী থাকতে পারে।

বৃদ্ধা মার উক্তি থেকে যামিনীর চরিত্রের দৃঢ়তা, কর্মপটুতা, সারল্য, সহনশীলতা ধরা পড়েছে। মা বলেছে, " রাতদিন খিট্ খিট্ করে মেয়েটাকে কত যন্ত্রণা দিই—তা কি আমি জানি না। তবু মুখে ওর রা নেই; এই শ্মশানের দেশ—দশটা বাড়ী খুঁজলে একটা পুরুষ মেলে না। আমার মতো ঘাটের মড়ারা শুধু ভাঙা ইঁট আঁকড়ে এখানে-সেখানে ধুকছে, এরই মধ্যে একাধারে মেয়ে পুরুষ হ'য়ে ও কি না করছে।"

যামিনী তার নিজের সম্পর্কে সচেতন। সে জানে অনেকেই তার মাকে ফিরে আসার কথা দিয়েও ফিরে আসে না। তাই সে লেখককে ছিপটিপ ছেড়ে যাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

গ. নিরঞ্জন

নিরঞ্জন যামিনীর মায়ের দূর সম্পর্কিত ভগিনীর পুত্র। যামিনীর মা তার সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন। নিরঞ্জন বছর চারেক পূর্বে এসে জানিয়ে গিয়েছিল যে বিদেশে চাকরী করতে যাচ্ছে, ফিরে এসে যামিনীকে বিয়ে করবেই। কিন্তু মণিদার উক্তি উদ্ধৃত করে বলা যায় যে সে কোনদিনই বিদেশে যায় নি। আর এই ঘুঁটে কুড়োনীর মেয়েকে উদ্ধার করতে তার দায় পড়ে গিয়েছে। মণিদা জানিয়েছে সে ইতিমধ্যে বিয়ে-থা করে সংসারী হয়ে গিয়েছে।

এখানে নিরঞ্জনই উদ্দীপক। গল্পের কেন্দ্রবিন্দু যামিনীর বিষয়টিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে সহায়ক। যামিনী নিরঞ্জনের কথা জানে। সেই জন্যে সে নিরঞ্জনের পথ চেয়ে বসে নেই।

ঘ. লেখক

লেখক তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে অবকাশ যাপনের জন্য মাছ ধরতে গিয়ে যামিনীর মায়ের করুণতম অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন যে তিনি আবার ফিরে আসবেন। কারণ যামিনীর মা তাঁকেই নিরঞ্জন বলে মনে করেছেন। লেখক বৃদ্ধার স্বপ্ন বা মোহ ভেঙে দিয়ে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাননি। লেখকও বলেছেন, 'আমি তোমায় কথা দিচ্ছি মাসীমা। আমার কথার নড়চড় হবে না।' এটা নেহাতই কথার কথা। যামিনীও জানে কিন্তু তার মা জানে না।

নিরঞ্জন বাস্তবিকভাবে মিথ্যা কথা বলে নিজেই সংসারী হয়েছে। কিন্তু লেখক একটা খেলা খেলেছেন মাত্র। সুতরাং নিরঞ্জন ও লেখক সমপর্যায়ভুক্ত নন। আর সেইজন্যই দেখা যায় সামান্য কিছু সময়ের জন্য 'তেলেনা-পোতা' তাঁর স্মৃতিতে ভেসে উঠলেই যামিনীর করুণ মুখচ্ছবি তাঁর মনে পড়ে এবং তখনই একটা বুক-ভরা ব্যথা টনটন করে ওঠে। নিরঞ্জনের সঙ্গে যামিনীর একটা সামান্য আত্মীয়তাও ছিল, কিন্তু লেখকের তাও নেই। লেখক শুধু অভিনয় করেছেন মাত্র। তাও নিরঞ্জন-প্রদত্ত আঘাতের মতো এই অভিনয় বেদনাদায়ক নয়। বরং এই অভিনয় গল্পটিকে পরিপূর্ণভাবে ট্রাজিক করে তুলতে সাহায্য করেছে। বাস্তবকে স্বীকার না করে অতীত ও ভবিষ্যতের রঙীন মায়ায় বর্তমানকে ছোপানোর মধ্যে যে আর্তি আছে তা যামিনীকে ব্যথাতুরা করেনি, বরং গল্পটির লক্ষ্য যামিনীর মানস জগৎ আবিষ্কার যা ক্ষণিকের জন্য নিরালায় তেলেনাপোতা আবিষ্কার করার একটি কামা রূপ নেয়। আর আবিষ্কার না হওয়ার জন্যই গল্পটি পাঠকের দীর্ঘ-শ্বাস কেড়ে নেয়। তাই লেখকের না-ফেরা আর নিরঞ্জনের না-ফেরা দুটি দুই মেরুতে অবস্থান করেছে এবং অর্থবহ দ্যুতিতে দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে।

ঙ. অন্যান্য :

গল্পে পানরসিক বন্ধু মণির পরিচয় পাওয়া গেছে, কিন্তু কুম্ভকর্ণের মতো নিদ্রাবিলাসী বন্ধুর কোন বিশেষ ভূমিকা নেই।

চ. উপসংহার ঃ

'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পটির অন্তরে গীতিকবিতা, কাব্যধর্মিতা[১] থাকলেও গল্পটির মূল আবেদন না-পাওয়ার বেদনার সঙ্গে না-আসা বা না-যাওয়ার অভিব্যক্তির Juxtaposition বা সংশ্লেষ ঘটেছে যেখানে একদিকে তীব্র হতাশা হাসির আবরণে আবৃত, অন্যদিকে প্রতিশ্রুতির দংশনে ক্ষতবিক্ষত মনের আকাশে স্মৃতির উজ্জ্বল তারকার চিত্র প্রতিবিম্বিত।

॥ গ্রন্থ নির্দেশ ॥

১. ভূমিকা 'শার্ল' বোদলেয়রের কবিতা'—অনুবাদ বুদ্ধদেব বসু—
দে'জ পাবলিশিং।

২. সাহিত্য-দর্শন - সুদর্শন দাস।

৩. রবীন্দ্র রচনাবলী ঃ গদ্য ও পদ্য / পঞ্চভূত ঃ ১৪ খণ্ড পৃঃ ৬৭০ পঃ বঃ সরকার ১৩৬২।

৪. রবীন্দ্র রচনাবলী ঃ ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৮৫৭।

৫. ছোটোগল্পের রূপশিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ রামরঞ্জন রায়।

গণতান্ত্রিকতা: আমি কবি যত কামারের এবং বেনামীবন্দর

'কবি' বা 'আমি কবি যত কামারের' [উত্তরা', ১৩২৮] এবং 'বেনামীবন্দর' দুটি কবিতাতেই কবি প্রেমেন্দ্রের গণতান্ত্রিকতা প্রকাশমান। শ্রমজীবীদের প্রতি সহানুভূতি তাঁর এই কবিতায় ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। কামার, কাঁসারি, ছুতোর, মুটে মজুর, ইতর সম্প্রদায়, কৃষক, খনির শ্রমিক, কুম্ভকার, নাবিক, কাঠুরে, প্রমুখ প্রতিটি মানুষের প্রতি সহমর্মিতায় তাঁর হৃদয় উদ্বেল। এই পৃথিবীটাই কবির কাছে 'বেনামীবন্দর', আর সেখানেই বিপর্যস্ত মানুষের বাস। তাই তিনি তাদের ব্যথার ব্যথী। তাই তাঁর প্রিয়ার সান্নিধ্য এই মুহূর্তে অনভিপ্রেত। কবি বলেন, 'স্বপ্নবাসরে বিরহিণী বাতি / মিছে সারারাতি পথ চায়, / হায় সময় নাই।' এই কবিতায় অসংখ্য সাধারণ মানুষের Composite image নিয়ে সামগ্রিক সমাজ-প্রতিমা সৃষ্টি হয়েছে। কতকগুলি প্রতিমা:

১ মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত /
সাগর মাগিছে হাল

২ পাতালপুরীর বন্দিনীধাতু, / মানুষের লাগি
কাঁদিয়া কাটায় কাল

৩. দুরন্ত নদী সেতুবন্ধনে / বাঁধা যে পড়িতে চায়

৪. মাটির বাসনা পুরাতে ঘুচাই / কুম্ভকারের চাকা

৫. আকাশের ডাকে গড়ি আর মেলি / দুঃসাহসের পাখা

৬. ধরণীর গূঢ় আশার দেখাই উদ্যত অঙ্গুলি !

৭. প্রিয়ার কোলেতে কাঁদে সারঙ্গ।

৮. স্বপ্নবাসরে বিরহিণী বাতি / মিছে সারারাতি পথ চায়,

মাগে, বন্দিনী, বাঁধা, বাসনা, ডাকে, গূঢ় আশার, কাঁদে, মধুর মিনতি, বিরহিণী এই ক্রিয়াপদ ও বিশেষণ বা বিশেষ্যপদ চিহ্নিত করে দিচ্ছে কতক-

গুলি প্রতিমা—যেমন মাটি, ধাতু, নদী, মাটি, আকাশ, সারঙ্গ, বাতি একদিকে কবির রোম্যাণ্টিকতা প্রকাশ করেছে, তেমনি সমাজ-বাস্তবতাও তুলে ধরেছে। এ ছাড়া তিনি কামার, ছুতোর, নৌকর্মী, শ্রমিক, কাঠুরে এবং দিনমজুরদের জীবনযাত্রার চিত্র এঁকেছেন এবং তাদের সঙ্গে কবি যে সামিল হতে পেরেছেন—সেই কথাও বলতে পেরেছেন।

নভেম্বর বিপ্লবের তরঙ্গ আমাদের দেশের উপর যখন আছড়ে পড়েছিল, তখন বাংলার মধ্যবিত্ত মানুষ বিশেষ করে শ্রমিক কৃষক বা মেহনতি সম্প্রদায় তখন উদ্বুদ্ধ হয়েছিল—তারই ফলশ্রুতি হিসেবে দেখতে পাই শিল্পী সাহিত্যিকগণও কলম ধরেছিলেন। 'সংহতি', 'লাঙ্গল', 'গণবাণী' প্রভৃতি পত্রিকারও জন্ম হয়েছিল ধারাবাহিকভাবে। ঠিক এই সময়ে সাধারণ মানুষের সপক্ষে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র দাঁড়ালেন সরবে। ইতর মানুষের সামিল তাঁর পূর্বে তো আর কোন কবি হননি। আর এভাবে তাদের কথা সোচ্চারে কেউ বলেননি। কবির সচেতন স্বীকারোক্তি যে 'বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের ভাই, / সময় যে হায় নাই!' কৃষক শ্রমিক, এবং সমাজের নানাস্তরের কর্মীবন্ধুদের কর্ম-ধারা কবিকে স্বতন্ত্র এক ঋদ্ধি এনে দিয়েছে। তাই তাঁর মনের গহনে যে রোম্যাণ্টিসিজম দানা বাঁধছিল, তার অবসান তিনি ঘটাতে চান। জ্যোৎস্নারাতে প্রিয়ার কোলে 'সারঙ্গ কাঁদে, তার চোখের কোলে দুটি ফোটা অশ্রু জলের মধ্যে প্রিয় সান্নিধ্যের মধুর মিনতিকেও তিনি উপেক্ষা করেছেন। কারণ তিনি বিশ্বকর্মার যেখানে হাজার কর্মী নিয়ে ব্যস্ত সেখানে তিনি 'চারণ' কবি। 'হায়' শব্দে একটা বিষাদময় মানস চিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। ইচ্ছে থাকলেও কবি কর্মে এমন ভাবে বন্ধ অর্থাৎ সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্যেই কবি প্রেমকেও উপেক্ষা করেছেন।

'মাটি', 'সাগর', 'ধাতু', 'নদী', 'আকাশ, 'পাখি', ধরণী' 'সারঙ্গ', 'বাতি'র প্রত্যক্ষ প্রতিমা তুলে ধরেছেন। এই বাক্ প্রতিমাগুলি ছাড়া কবি যে চিত্রগুলির বাণীমূর্তি উপস্থাপিত করেছেন তাতে কামার, কাঁসারি, ছুতোর, মুটে মজুর, কৃষক, নাবিক, কুমোর, জেলে, কাঠুরের কর্ম-চাঞ্চল্য একটি কংক্রীট রূপ নিয়েছে।

এই কবিতার বিশ্লেষণে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে বিখ্যাত কবি হুইটম্যানের চেয়ে স্যাণ্ডবার্গের কাছাকাছি দেখতে পাই। হুইটম্যান বলেছিলেন এই শ্রমিক সমাজের কাজের মধ্যে একটা শাশ্বত অর্থ খুঁজে পাই কিন্তু স্যাণ্ডবার্গ বলেছিলেন, আমিই জনতা আমার মাধ্যমেই পৃথিবীর বিশাল কর্ম সংগঠিত হয় [দ্রষ্টব্য : প্রেমেন্দ্র মিত্র : কবি ও ঔপন্যাসিক পৃঃ ৬০] কোনক্রমেই বলে চলে না যে প্রেমেন্দ্র মিত্র বিলাসী কবি, তাঁর কবিতার বাক্-বন্ধে যে সত্য,

উচ্চারিত, সেই সত্য তাঁর জীবনসত্য নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবনের প্রথম ভাগ থেকে নানা কর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে, প্রতিটি কর্মের সার সত্য জানতে চেয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য যে তিনি নীচু সমাজের মানুষের সামিল হওয়ার জন্যে ব্রত গ্রহণ করেছেন, একথা মানা যায় না, এ সম্পর্কে একটিই কথা বলা যায় কবির জীবনের সঙ্গে কাব্যের সকল সময় সরাসরি মিল থাকবে এমন কোন নিশ্চয়তা থাকে না। কখনো কখনো মিল হয়ে যেতে পারে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কবি' 'সাগর থেকে ফেরা' কবিতায় সে স্বীকারোক্তি এখানে তুলনীয় হতে পারে: আমাদের কথা কেউ সব জেনে নিয়ে, / তবু প্রমাণের খোঁজে, খুঁড়ে খুঁড়ে চলে যায় / কথার ওপারে। ফিরে চেয়ে দেখে এই / জনগণমন, অলীক শব্দের জালে / কিভাবে জড়ানো।... চিহ্নিত সে জন তাই কথার পিছনে উপনীত / হয়েও, ফিরেই আসে আমাদের প্রাঙ্গণে প্রান্তরে / সেধে নিয়ে দায়, / শব্দের খোলস খুলে, অকপট খুঁজে খুঁজে ফেরে / অবিকল অনির্বচনীয়! / আমাদের নাম, ধাম, সব পরিচয় / তার চোখে পড়ি যদি / দুঃসহ সে বিদ্যুৎ বিস্ময়!' সুতরাং তিনি হুইটম্যানের কতকগুলি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন বলেই তাঁকে Poet of Democracy আখ্যা দিতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই যদিও 'নিজের গান গাই' এবং 'শুনেছি আমেরিকার গান' কবিতা দুটিতে জনগণের কথাই স্পষ্ট।

ক 'আমার নিজের গান গাই / সাধারণ স্বতন্ত্র এক সত্তার। / তবু আমার কণ্ঠে গণতান্ত্রিক এই শব্দ উচ্চারিত, / উচ্চারিত জনগণের নাম।'
['নিজের গান গাই' / হুইটম্যানের শ্রেষ্ঠ কবিতা]

খ 'আমেরিকা গাইছে, আমি শুনতে পাই / শুনি বিচিত্র তার সঙ্গীত। / গাইছে মিস্ত্রিরা নিজের, নিজের গান / জোরালো উল্লাস তাদের কণ্ঠে। / গাইছে ছুতোর তার কাঠের গুঁড়ি কি তক্তা / মাপতে মাপতে, / রাজমিস্ত্রী গাইছে কাজের আগে বা পরে, / মাঝির গান তার নৌকোর সম্পত্তি নিয়ে / মাল্লা গাইছে স্টীমারের পাটাতনে।' ইত্যাদি

[শুনেছি আমেরিকার গান / 'হুইটম্যানের শ্রেষ্ঠ কবিতা']

কবির সামাজিক দায়বদ্ধতা অনস্বীকার্য। কবি ও সঘনেস লিখেছিলেন, 'কবিরা সংগীত সৃজনকারী, কবিরাই স্বপ্নের দ্রষ্টা' কবিরাই পৃথিবী নির্মাণ করেন।' উপনিষদে বিধাতাকে কবি বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে কবি যে আনন্দ রস ধারার স্রষ্টা এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কবিকে সমাজের বাস্তবতায় নেমে আসতে হয় সঙ্গত কারণেই। তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুতে সমাজ; কিন্তু তাঁর শৈলীতেই রস-ধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

বাংলায় বিংশ শতাব্দী বাংলায় বিশের দশকে তেমনি এক বাস্তববোধের ধারা এসেছিল কবিতার জগতে। তা রাশিয়ার বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কবিতায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজ ও রাজনীতিকে পট পরিবর্তন এসেছিল। আধুনিক কবিগণ সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। যদিও কোন কোন সমালোচক কবি এঁদের ভালোভাবে গ্রহণ করেননি, তবুও বলা যায় এঁরা সবাই বিলাসী নন, সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন তাঁদের সামিল হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য নিজেও এঁদের সকলকে স্বীকার করতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন, অন্যান্য সকল বেদনার মতোই সাহিত্যে দারিদ্র্য বেদনারও যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু ওটার ব্যবহার একটা ভঙ্গিমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে—যখন তখন সেই প্রয়াসের মধ্যেই লেখকেরই শক্তির দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। 'আমরাই রিয়ালিটির সঙ্গে কারবার করে থাকি, আমরাই জানি কাকে বলে লাইফ' এই আস্ফালন করবার ওটা একটা সহজ ও চলতি প্রেসক্রিপসনের মতো হয়ে উঠেছে। অথচ এদের মধ্যে অনেকেই দেখা যায় নিজেদের জীবন-যাত্রায় 'দরিদ্রনারায়ণ'-এর ভোগের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই রাখেন নি—ভালোরকম উপার্জনও করেন, সুখে স্বচ্ছন্দেও থাকেন—দেশের দারিদ্র্যকে এঁরা কেবল নব্য সাহিত্যের নূতনত্বের ঝাঁজ বাড়াবার জন্যে সর্বদাই ঝাল-মশলার ব্যবহার করেন।' ['সাহিত্যে নবত্ব' / 'সাহিত্যের পথে'] বিশের দশকের কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের ক্ষেত্রে এ উদ্ধৃতি খাটে না। তিনি নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান—কত রকম কাজের সন্ধানে তিনি এ কাজ থেকে ও-কাজে হাত দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর এই সমাজ ভাবনা কাল্পনিক নয়, বরং এই লেখার জন্যে তিনি প্রকৃত গণতান্ত্রিক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেলেন। ঐ পর্বে তাঁর 'পাঁক' [মুচীর জীবন কাহিনী] আর এই কবিতার সঙ্গে 'বেনামীবন্দরে' অতি সাধারণও উপেক্ষিত বা নির্যাতীত মানুষের projection তৎকালীন মানুষকে আলোড়িত করেছে।

'কল্লোল' [ভাদ্র, ১৩৩২]-এর পাতায় 'বেনামীবন্দর' তাঁর এমনই এক অনবদ্য কবিতা যার মধ্যে ছিল সাধারণ মানুষের কথা। তার পূর্বে ১৩২৮ সালে 'উত্তরা'তে তাঁর 'আমি যত কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের / মুটে মজুরের,—আমি কবি যত ইতরের' বেরিয়ে গেছে। কবির এই কবিতায় যে গণতান্ত্রিকতায় চিত্রাভাস দেখা গেছে তা নিঃসন্দেহে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন দারিদ্র্য দুঃখ পীড়িত সমাজের প্রতি একজন কবির দায়বদ্ধতাই প্রকাশ পেয়েছে। কবি সেখানে সোচ্চার এই বলে যে 'আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের ; / বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের

তরে ভাই, / সময় যে হায় নাই।' এই কবি তখন স্কুলের খাতায়, মুচীর জীবন কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লিখছেন 'পাঁক'।

'বেনামীবন্দর' কবিতাতে এই দুনিয়ার বুকে যে সর্বহারা মানুষের জীবন-আর্তি প্রকট হয়েছে। সত্যি সর্বহারা মানুষ 'ভাঙা জাহাজ'ই। এই ভাঙা জাহাজ বাক্-প্রতিমায় কবি যে ভাবে দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট মানুষের জীবনধারার চিত্র এঁকেছেন, সমকালীন আর কোন কবির কবিতায় তা ধরা পড়েনি। কবিতাটির একটি স্তবক উদ্ধার করা যাক :

'মহাসাগরের নামহীন কূলে / হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই, জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভীড়। মাল বয়ে বয়ে ঘাল হ'ল যারা / আর যাহাদের মাস্তুল চৌচির / আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল / বুকের আগুনে ভাই, / সব জাহাজের সেই আশ্রয় নীড়।'

সারা বিশ্ব মহাসাগর সদৃশ। এখানের বন্দর এই পৃথিবী যেখানে হতভাগাদের ভিড়। কারণ এই মহাবিশ্বে তো আরো অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ আছে, সেখানে প্রাণের বিকাশ নেই, তাই সেখানে মানুষ বাস করে না কিন্তু এই পৃথিবীর বুকে কবি যাকে 'বন্দর' প্রতিমায় চিহ্নিত করতে চান সেই বন্দরে অসংখ্য ভাঙা জাহাজ। এই ভাঙা জাহাজ দীর্ণ দুঃখী সর্বহারা মানুষের প্রতীক বা প্রতিমা বলা যায়। কবি ভাঙা জাহাজের যে দীর্ণ রূপটা উপস্থাপিত করেছেন তাতে কটি বিশেষণ বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে :

ক. মাল বয়ে বয়ে ঘাল হ'ল যারা।

খ যাহাদের মাস্তুল চৌচির।

গ যাহাদের পাল গেল পুড়ে বুকের আগুনে।

ঘ. কূলহীন যত কালাপানি মথি' / লোনা জলে ডুবে নেয়ে / ডুবো পাহাড়ের গুঁতো গিলে আর / ঝড়ের ঝাঁকুনি খেয়ে / যত হয়রান লবেজান তরী / বরখাস্ত্ হল ভাই / পাঁজরায় খেয়ে চিড় ;·· সেই অথর্ব ভাঙা জাহাজের ভিড়।

ঙ হালে পানি মিলে না আর।

চ কোমরের জোর কমে গেল যার ভাই।

ছ ঘুণ ধরে গেল কাঠে,

জ. আর কলজেটা গেল ফেটে,

ঝ জনমের মত জখম হ'ল যে যুঝে,

ঞ শিরদাঁড়া যার দুবঁকে গেল, আর দড়াদড়ি গেল ছিঁড়ে।

ট. কল ও কব্জা বেগড়াল অবশেষে,

ঠ. জোয়ালে গেল ধুয়ে যার আর পতাকাও পড়ে নুয়ে
ড জোড় গেল খুলে
ঢ ফুটো খোলে আর রইতে নারে ভেসে।

দুনিয়ার সেইসব হতভাগা অসমর্থের নির্বাসিতের নীড় এই দুনিয়া।

রাশিয়ার রাজতন্ত্র পতনের পরে যখন সমাজতন্ত্রের অভ্যুত্থান ঘটেছে, যখন শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে দিকে দিকে সংবাদের ব্যাপ্তি ঘটছে, তখনই এই অনবদ্য কবিতাটিতে দুনিয়ায় হতভাগ্য মানুষের জীবনের করুণতম রূপটি কবির লেখনীতে নতুনরূপে ফুটে উঠল। কবি ভাঙা জাহাজের মাধ্যমে অসমর্থ মানুষের বাক্‌প্রতিমা অঙ্কন করলেন। অসমর্থ মানুষের জন্য কি কোন আলোকোজ্জ্বল জগতের ব্যবস্থা নেই? শোষণ নিপীড়ন কি শুধু ওদের জন্যেই। এই কি ওদের পৃথিবীর জন্মের সার্থকতা? কবি তো একটি কবিতায় তাদের সপক্ষে বলেছিলেন, 'দ্বার খোল, খোল দ্বার, রাত্রির প্রহরী'—কেঁদে কয় হতভাগ্য নিঃসম্বল মানবের দল, কেঁদে কয় দিকে দিকে! নিষুত জীবন।' ['দ্বার খোল' / সংহতি. শ্রাবণ, ১০৩১] 'বেনামী বন্দর' কবিতা প্রকাশের পূর্বে সংহতিতে প্রকাশিত এই কবিতার কবি সর্বহারা মানুষের পক্ষে সোচ্চার হয়েছিলেন. প্রতিটি নিঃসম্বল মানুষের বুকে যে আলোর পিপাসা, সেই পিপাসা মেটানোর জন্য তাঁর শেষ উচ্চারণ: 'হে প্রহরী, হানো অসি নিশার মরমে,—/ যুগ যুগান্তের সঞ্চিত আঁধার কেটে যাক / বেদনার উষ্ণ রক্তধারে; / রক্ত-পারাবার হতে উদ্বোধন হোক আজ নূতন 'উষার' [দ্বার খোল' প্রথমা]।

এই সেই কবি যিনি কম্যুনিজমে দীক্ষিত না হয়েও রক্ত পারাবার থেকে নূতন উষার উদ্বোধন কামনা করেন। এই মানসিকতা নিয়েই তাঁর বেনামীবন্দর 'বেনামীবন্দর' বেশ কয়েকটি ভিন্ন চরিত্রের প্রতিমাও দেখা যাবে। এখানে নিঃস্ব রিক্ত মানুষের সাথে এসেছে বণিকবৃত্তি ও ঔপনিবেশিকতা। যেমন কবিতার তৃতীয় স্তবকে: 'দুনিয়ার কড়া চৌকিদারী যে ভাই / হুঁশিয়ার সদাগরী' /।' সারা দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদীরা কড়া চৌকিদারী করছে, তারা সদাগর', তারা তো দেশে বিদেশে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত। তাদের কাছে মানুষও পণ্য সদৃশ।

তবে একথা ঠিক যে, 'বুকের আগুনে' অর্থাৎ সঞ্চিত উদ্দীপনায় সাজানো পালও পুড়ে যেতে পারে। সেটা তো উপলক্ষ মাত্র। এতে তাদের কোন ভয় ভয় নেই। কারণ তাদের কাছে জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনা হীন। তাই যে সমস্ত জাহাজ বন্দরেই খারিজ হয়ে গেল নানা ব্যথা

বুকে নিয়েও অথর্বতার জন্যে বন্দরে কোন স্থান হোল না. সওদাগর তাদের খাতা থেকে ঐসব জাহাজের নাম মুছে দিয়েছে। নিঃস্ব রিক্ত মানুষ শ্রমজীবী মানুষ যেদিন কাজ করতে অসমর্থ হবে, সেদিন তাদেরও বিদায় নিতে হবে এই পৃথিবীর কর্মক্ষেত্র থেকে। শ্রমজীবী মানুষের কাছে এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। যে মানুষ দীর্ঘজীবন সমাজের কাজ করলো, প্রৌঢ়ত্বে বা বার্ধক্যে সেই মানুষ অবহেলিত হচ্ছে। এরাই একদিন কত মাল বয়েছে—দেশ থেকে দেশান্তরে বুকের উষ্ণতা দিয়ে দেশকে ভাল বেসেছে। অথচ কলুজেতে জোর কমে গেলে ভাঙা জাহাজের মত বন্দরের বুকে স্থান পায় না। এদের স্থান সেই বন্দরে যার নাম নেই– বেনামী।

তাহলে কি বেনামী বন্দর বলে কোন বন্দর নতুন সৃষ্টি হচ্ছে? কোন কালে ছিল? পৃথিবীর অসমর্থ মানুষের জন্যে অন্য কোন পৃথিবী সৃষ্টি হবে? এটাও কি ভাবা যায়? পাশ্চাত্ত্য দেশে বৃদ্ধ পিতামাতাকে পুত্র কন্যারা দেখে না—অকর্মণ্যতার জন্যে যা প্রাচ্যে কল্পনা করা যায় না। আমরা তো সেই রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখি যেখানে ধন বৈষম্য থাকবে না, বর্ণ বৈষম্য থাকবে না, যেখানে মানুষ রাষ্ট্রের জন্যে, যার যতটুকু ক্ষমতা তা উজাড় করে দেবে- আর বিনিময়ে রাষ্ট্রও সেই মানুষদেরও বাঁচাবে, ভরণপোষণের দায়-দায়িত্ব নেবে। তাহলে এই কবিতাতে কবি সেই সমাজ-তান্ত্রিক দেশের কল্পনা করছেন না কি? সেই রাষ্ট্র চাই যেখানে সমর্থ অসমর্থ সবাই থাকবে, রাষ্ট্র প্রত্যেকের মর্যাদা দেবে—যে একদিন বুকের রক্ত দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে আজ তার অসামর্থের জন্যে সে অবহেলা বঞ্চনা পাবে না। পাবে পরিপূর্ণ আশ্রয়। কবি মহাসাগরের নামহীন কূলে সেই বেনামী বন্দরের অভিযাত্রী; যে কবি একদিন 'পাঁক' উপন্যাসে মুচি কালাচাঁদ ও নেত্যর জীবন কাহিনী তুলে ধরেছিলেন তিনিই 'বেনামী বন্দর' রচনা করলেন দুনিয়ার হতভাগ্য অসমর্থ মানুষের জন্যে। এটা কোনক্রমেই বিলাস নয়। এটা সর্বার্থেই মানবিকতাবোধে উদ্দীপ্ত।

'সাগর থেকে ফেরা'

সেই কৈশোর থেকে যে কবি রোলিংস্টোনের মতো ঘুরেছেন এদিক ওদিক, একাজ ছেড়ে ও কাজ, এপাঠ ছেড়ে ওপাঠ সেই কবির অন্তরে ছিল অমৃত পিপাসা। সাগর সিঞ্চন করে পাওয়া অমৃত কি তাঁর কাম্য ছিল? যে কবি একদা 'প্রথমা'য় শুনিয়েছিলেন, 'স্বপ্নবাসরে বিরহিণীরাতি / মিছে সারারাতি পথ চায়, / হায় সময় নাই', যে কবি বলতে পেরেছিলেন 'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের, / মুটে মজুরের / আমি কবি যত ইতরের!' অথবা যে কবি সোচ্চার হলেন এই বলে যে, 'রক্ত পারাবার হতে উদ্বোধন হোক আজ নূতন উষার' সেই কবিই কি অন্তরে লালন করতেন এক ইন্দ্রিয়াতীত অমৃতের আস্বাদন? সেই কবি কি মনে মনে চাইতেন কোন আধ্যাত্মিক আকাশের ওপারে আকাশ? তা যদি না হয় তাহলে কেন লিখলেন, 'এ এক জোনাকি মন / জ্বলে আর নেভে' / অন্ধকার পার হ'বে ভেবে, / ইতি উতি ধায়;…তবু, / আঁধারের গূঢ় ধ্বনি / শুধু এ সৃষ্টির / ছুপ্‌ ছুপ্‌ বেয়ে চলা দমকে দমকে। / তারই ছন্দে জ্বলে, নেভে, চমকে চমকে / দপ্‌ দপ্‌ কি জোনাকি-মন? জানা না-জানার চেয়ে কোনো / অন্য উত্তরণ!' 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যের এই প্রথম কবিতাতেই কবির 'অন্য উত্তরণ' কি সত্যি কাম্য রূপ নিয়ে তাঁর সারা জীবনের সাহিত্য সম্ভারের ওপর কোন প্রতিক্রিয়া রচনা করেছে?

প্রেমেন্দ্র মিত্র সারা জীবনই সংশয় আর প্রশ্ন মনস্ক মন নিয়ে হেঁটেছেন। তাই এই অন্য কোন উত্তরণের কাছে ও বিস্ময়সূচক চিহ্ন দিয়ে তা আরও বিস্ময়, যা বিপন্ন বিস্ময় হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি এমন একটা নিটোল অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। 'প্রথমা'র কবি গণতান্ত্রিক, বিশ্লেষণবাদী, অনেক বেশী ভাব সৌকর্যে ভরপুর। 'সম্রাট'-এ এসে সেই কবি আরো বেশী সংহত, আরো অনেক অনেক স্পষ্ট। প্রথমার এ্যাবস্ট্রাক্ট রূপ সম্রাটে এসে কংক্রীট হয়েছে। তাই সম্রাটে শস্য প্রশস্তি বা 'সম্রাট', 'তামাসা' বা 'নীলকণ্ঠে'র মতো জরি-বুটি-কাজ করা কবিতা তাঁর কাছে পেয়েছি। কিন্তু আমরা তো জানি কবি স্থির নন, কবি অচঞ্চল নন। তাই হঠাৎ হঠাৎ দু একটি কবিতা পেয়ে

যাই যেখানে কবি বলে ওঠেন : 'সাগর পাখিরা সব কোথা যায় ? / আকাশ পারের কোন্ সে কুলায় ! / মেঘেরা কি তাহা জানে, / চাঁদ কি সেকথা মানে ? বৃথাই অতল জল উছলায়।' ['সাগর পাখীরা'] এটা তো শাশ্বত সত্য যে সাগর অসীম—সাগর পাখীরা কি সেই অসীম অনন্তের কোনো ঠিকানায় চলে যায় ? সত্যি যায় ? তা কি সম্ভব ? এখানেই কবির সম্ভব অসম্ভবের দোলাচলবৃত্তি। কবি তো তাঁর প্রথম জীবনের উপন্যাসে ['উপনায়ন'] বিনুকে সন্ন্যাসী করে ছেড়েছিলেন, কিন্তু শেষ জীবনের উপন্যাস 'যিনি বিধাতা'য় নির্মলাকে সন্ন্যাসিনী থেকে ফিরিয়ে এনে কোথায় নিয়ে যাবেন সে পথ নির্দেশ করতে পারেন নি। যিনি বিধাতা তিনিই পথ নির্দেশ করবেন। এই প্রেক্ষিতেই আমরা কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর থেকে ফেরা' কবিতাটির রস-বিচার করবো, বিষয় এবং শিল্পরীতির স্বাদ গ্রহণ করবো। সাগরের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। সব নদী সাগরে মিলায়। সংগমে পেঁছিনোর ব্যাকুলতা তো সব নদীর, সব স্রোতের, সব চলমান জীবনের। কিন্তু সাগরই তো সব কথা নয়। এই ঘর এই সংসার এই সুখ দুঃখ হাসিকান্না দীর্ণ আবার অলংকৃত জীবন বাদ দিয়ে অধিত্যকা উপত্যকা—নদীর দুধারের বিস্তীর্ণ প্রান্তর ছাড়া তো নদীর জীবনের চিত্র আঁকা যায় না ক্যানভাসে। কখনো কখনো তাই সাগরে এই মুহূর্তে পেঁছানোর কোন দরকার নেই। সাগর তো পরিণতি, সাগর তো সংগম-তীর্থ। অনেকের তাই সাগরে পেঁছানোর পূর্বের জীবনই লক্ষ্য। সেখানে যে শত সহস্র সাধারণ মানুষের ব্যাপ্তি। কবি তো নাবিক হতে চান। কবি নিরুদ্দেশ খেয়ান করেন—রোম্যান্টিক কবির এ হেন দূরে-চারিতার পাশে আবার সকলকে নিয়ে মিলে মিশে প্রাণে প্রাণে নিবিড় হয়ে থাকার বাসনা প্রকট। যখন কবি বলেন, 'মত্ততা ছেড়ে মনের গভীরে এস না, / নেশা নয়, যাব পরম পাওয়ার এষণা' ['সত্য'] ঠিক তখনই তাঁর মনের গভীরে আ-দূর দ্বীপ থেকে ঘরে ফেরার জন্যে ব্যাকুল হয়ে হঠে, প্রিয়জনদের সান্নিধ্য লাভের জন্যে উৎসুক হয়ে ওঠে : 'দিক চক্রবালে যবে দেখা দেয় উৎসুক মাস্তুল, / উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুল / কেউ কেউ ভুলে গিয়ে সমস্ত সংকেত / চেয়ে রয় শুধু হতাশায়' ['দ্বীপ'] আসতে পারে না। কিন্তু তাঁকে যে সাগর থেকে ফিরতে হচ্ছে, কবি প্রথমায় বলেছিলেন, 'নৌকা মোদের নোঙর জানে না, শুধু চলে স্রোতে ভাসি' অথবা সম্রাটে 'সাগর পাখীরা উড়ে চলে তাই, / আকাশের কোনখানে সীমা নেই। / চাঁদের নয়নে জল / মেঘমায়া ছলছল / সিন্ধু যে উতলা সদাই' ['সাগর পাখীরা']।

এই সবকথাই মাত্রা পেয়েছে 'সাগর থেকে ফেরা' কবিতায়। কবির নাবিকমন এখন নীল নীল শুধু নীলিমা থেকে ফিরে আসছে স্থলে-মাটিতে-সংসারে। কবি সাগরে গিয়ে কি দেখেছেন? দেখেছেন, 'শূন্যের আনমনা হাসির সামিল / ক'টা গাঙ্ চিল'। আর ঠিক সেই সময় তার মনে হয়েছে ঐ চিল 'শাখ-মাজা ডানা মেলে / আকাশের তল্লাশ নিচ্ছে।' কিন্তু এই দৃষ্টি-নির্ভর দৃশ্য দেখে তাঁর মন কিন্তু থেমে নেই—সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় অনুভব বেদ্য একটি স্বপ্ন তাকে নাড়া দিয়ে গেছে—তিনি যাঁকে খুঁজছেন তার উপমা —না, নেই সব মিথ্যে আবার, 'হৃদয় দু'চোখ হয়ে শুধু গেয়ে ওঠে, সেই! সেই! তাহলে কি কবি তাঁর পরম পাওয়ার এষণাটাকে এই মুহূর্তে বড় করে দেখেছেন? এই পরম পাওয়া কি সেই লোকোত্তর প্রতীককে পাওয়া? তা যদি হয় তাহলে তাঁর জীবনদর্শনের শ্রেষ্ঠ কবিতা এটি। তাঁর জীবনদর্শনে 'অক্সিমোরণ' সকলসময় সবক্ষেত্রেই। পাওয়া না-পাওয়ার খেলা চলছেই। সাধারণ বাঁচার বাসনা তাঁর কোন কালেই নয়—তাই সাগর সাধনা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা প্রথমজীবনের একটি চিঠি তারই যথেষ্ট প্রমাণ: 'সত্যি নিজেকে আর চিনতে পারি না। মনে হয় প্রেমেন্দ্র বন্ধু ছিল তাকে আমার মধ্যে খুঁজে পাই না। মনে হয় গাছের যে ডাল-পালা একদিন দুবাহু মেলে আকাশ আলোর জন্যে তপস্যা করত যার লোভ ছিল আকাশের নক্ষত্র, সে ডালপালা আজ যে কেটে ছারখার করে দিয়েছে। শুধু অন্ধকার। মাটির জীবন্মৃত গাছের মূলগুলো হাতড়ে হাতড়ে অন্বেষণ করছে শুধু খাবার, মাটি আর কাদা, শুধু বেঁচে থাকা— —কেঁচোর মত বেঁচে থাকা। এ প্রেমেন তোদের বন্ধু ছিল না বোধহয়' ['কল্লোলযুগ']। এবং এটাই স্থির সত্য যে এ প্রেমেন কোথাও শান্তি পাননি। না ঘরে না ঘাটে। অথচ ঘরে শান্তি নেই বলেই ঘাটে—সাগরে তাঁকে যেতে হোল। তাই 'হৃদয়' তাঁর দু'চোখের ভূমিকা নেয়। ইন্দ্রিয়ান্তর ('সিনেসথিসিয়া') ঘটে গেলো, তিনি ফিরলেন। যে জাহাজে তিনি নাবিক হয়ে গিয়েছিলেন, লোনা ঢেউ-এ আলগোছে ভেসে মাটি, গাছ, তাঁর সব একেবারে ফেলে দিয়ে আসা / সুবিশাল ডানা মুড়ে' পাখী যেমন যেমন নীড়ে ফেরে, তেমনি ফিরলেন। এই অসীম সাগরের বুকে অনন্ত-নীলের মাঝে তাঁর মেঘ, তারা, হাওয়ার সঙ্গে সংশ্লেষ ঘটেছে, ঠিক সেই সময় তিনি প্রত্যাবর্তনের ভাবনা ভাবছেন। কিন্তু আশ্চর্য এই ভাবনাটাও ভাবতে পারছেন না—ভাবনাটা বাস্তবায়িত করতে না করতেই 'কি যেন কি যেন ঠিক / মন দিয়ে জানতে না জানতে / স্টীমার পোঁছে যায় / আজ-কাল-পরশুর প্রান্তে'। তাহলে জাহাজই তাঁকে তাঁর

ভাবনার চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছালো ? তার নিজের বাসনাকে মূর্ত করতে একটা যন্ত্র মাধ্যম হোল ? জোর করে ? তাই কি হয় ? তিনি তো জাহাজ যাত্রী হয়েছেন। ঘরে-ফেরার অনুমতিপত্র নিয়েই তো জাহাজে উঠেছেন।

আসলে, যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর ছিল। সেখানে পৌঁছেই মন আবার মাটীর মানুষের দিকে চলে এসেছে। পরম পাওয়ার এষণায় তিনি ইহলোক ছেড়ে, এই মাটী ছেড়ে আকাশে সাগরের হয়তো কোন জগতে বাস্তবায়িত করার মানসিকতা নিয়েছিলেন কিন্তু সেখানে পৌঁছেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—এখানে নয় - অন্য কোথা অন্য কোনখানে এঁকে পাওয়া যাবে। সেই জগৎ হল মানুষের জগৎ। তাইতো তাঁর পরবর্তী জীবনের শেষকাব্য 'নতুন কবিতা'য় তিনি সঠিকভাবেই লিখেছিলেন,

> 'যুগযুগান্তের সমস্ত সঞ্চিত পাপের পাষাণভার
> আকাশ ছোঁয়া অম্ভ্রংগারে যা চূর্ণ বিদীর্ণ করবে
> সে মহা আলোড়নের রুদ্ধ গর্জনধ্বনির আশায়
> কান পেতে আছ কি পৃথিবীর বুকে ?
> ওখানে নয় ! ওখানে নয় !
> প্রলয়ের আগমনী জানতে,
> মানুষের চোখের দিকে তাকাও,
> তোমার পাশে যারা আছে তাদের
> নিত্য দুবেলা যাদের দেখছ, তাদেরও।'
>
> ['প্রলয় বিধাতা']

তাই মানুষের অন্তরে তিনি সেই ঠিকানা পেয়েছেন বলেই তাঁকে আবার সাগর থেকে ফিরতে হচ্ছে। এই যে সীমা-অসীম অসীম-সীমায় দ্বন্দ্ব মিলন এখানেই কবির সঠিক চারিত্র রূপের প্রতিভাস বিম্বিত। অবশ্য অন্য একটি কবিতায় কবি যেন বৈজ্ঞানিক একটা যুক্তির প্রতিফলন জানাতে চান। পৃথিবীর বর্তুলাকার রূপ বলেই যেখান থেকে আরম্ভ করা হোক, সেখানেই মানুষ ফিরে আসা হবে। এটা তো মামুলি ছক। কবি লিখলেন,

> নিরুদ্দেশের পাল তুলে তবু
> নিজের সীমায় দুলবে,
> যেখানেই কেন রওনা হও না,
> প্রাণ তার বেড়া তুলবে।

বেড়া দেবে, দেবে, দেবেই,
যতই ভাবো না কিছু নেই,
ছাড়া পেতে ছোটো যেখানে, খুঁটির
বাঁধন কি করে খুলবে ?

['নিরর্থক' / হরিণ চিতাচিল]

এই মামুলি বন্ধনকেও কবি অস্বীকার করছেন না। কবির এই কথাও উপেক্ষিত হতে পারে না।

এই 'নিরর্থক' কবিতায় কবির ঈশ্বর চেতনার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর আমরা পেয়ে যাই। সীমার গণ্ডীবাদ জীবন যাপন করলেও অসীমকে বাদ দেওয়া যায় না—অসীমের আহ্বান আসবেই। সীমা ও অসীমের এই টানাপোড়েনেই জীবন। তাই কবি বলেন –

১ দরজা জানলা ভেজাও যত না / আকাশই তোমায় খুঁজবে।

২. তেপান্তরে হারাতে চাইলে / সেই দেয়ালেই ফিরবে।

৩. নিরুদ্দেশের পাল তুলে তবু নিজের সীমায় দুলবে,

৪. যে ঘাটেই কেন নোঙর ফেলনা, / সাগর তবুও ডাকবে !

এবং মানুষ যেখানেই যাকনা কেন তাকে সীমার মধ্যে ফিরতে হবেই। সুতরাং 'ছক'-এ বাঁধা জীবনের ছক ছিন্ন করা নিরর্থক। কবি অন্যত্র বলেছেন,

'ছক পাতা খেলা চলেছি খেলতে খেলতে। / হুকুম কোথায় চালের বাইরে হেলতে ! / ইতিহাসও সেই একই মুখস্থ / সুরে আওড়ানো নামতা। / রাজার, প্রজার, নিজের গরজে / যে যেমন দেয়, নাম তা' ['ছক' / নদীর নিকটে] সুতরাং ছক ভাঙা যাচ্ছে না।

কবি এই কবিতায় জানিয়েছেন যা তাঁর ঈশ্বর ভাবনা না হলেও এমন এক প্রাকৃতিক শক্তি যাকে পরম সত্তার অভিব্যক্তি বলা সঙ্গত। তিনি বলেন, 'যতই ভাবো না কিছু নেই, / একদিন ঠিক শিরায় শোণিতে / ছটফটে ছোঁয়া বুঝবে !' সুতরাং একদিকে সাগরের আহ্বান অন্যদিকে 'সাগর থেকে ফেরা' মাটীর ঘরে দুটোই সত্য এবং বাস্তব।

জীবনের বিশ্লেষণ ঃ মানে, নিরর্থক

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা মানব জীবনের 'মানে' অন্বেষণ করেন ব্যক্তিগত উন্নতির মধ্যে। তাঁরা চান আত্মসুখ। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদীরা বলেন সমাজের সুখেই মানব জীবনের যথার্থ পরিচয়। আবার মায়াবাদীরা বলেন, এ জীবন 'নিশার স্বপন'। কিন্তু কবি প্রেমেন্দ্র তাঁর প্রথম জীবনেই জীবনের মানে অন্বেষণ করতে গিয়ে এক অসাধারণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় উপনীত হয়েছিলেন। একে বস্তুবাদী ব্যাখ্যাও বলা যায়। মানুষের মনুষ্যত্ববোধই তার যথার্থ পরিচয়। এর বেশী মানবের কোন অর্থই নেই। এই মনুষ্যত্ববোধের মধ্যে অবশ্যই আছে আত্ম ওপর প্রসঙ্গ। নিজেকে বোঝা যেমন বিশেষ তাৎপর্যময়, তেমনি নিজের গণ্ডীতে থেকে অপরের সুখ-দুঃখ বোধও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই এই বিমূর্ত (abstruct) গুণগুলিই মানুষের কায়া এবং হৃদয় নির্মাণে কার্যকরী রূপ নেয়। কিন্তু এসবই ভাববাদী নয়, এর অনেকটাই বস্তুবাদী। প্রতিবেশীদের প্রতি আচার-আচরণ বাস্তবসত্য যা মনুষ্যত্ব বিকাশে সাহায্য করে। কিন্তু প্রেমেন্দ্র আরো একটু এগিয়ে বললেন বিজ্ঞানীরা যেমন পরীক্ষাগারে বিচার-বিশ্লেষণ করে সব কিছুর একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছয়, তেমনি মানুষকেও বিচার করতে হবে, তার শুধু গুণ নয়, তার দোষ, তার স্বভাব, তার অস্থি মজ্জাহাড়েরও।

কিন্তু এই কবি শেষ জীবনেই একটি কবিতায় মানুষের পরিমাপ করতে চেয়েছিলেন যা আমাদের এই কবিতাটি বিশ্লেষণের পক্ষে একান্তই জরুরী। মানুষের মানে' নয় 'মাপ'ই সেই কবিতার গূঢ়-তাৎপর্য'। কবি বললেন, 'মানুষের কত মাপ / কতজন কষে রেখে গেছে / দেহের নিরিখে কেউ, / কেউ হৃদয়ের / চেতনার মেধা ও মতির। / হিসাব মেলাতে শেষে / সব মাপ তবু যেন / হয় উপহাস, / জীবনকে স্বপ্নময় / কুয়াশায় আদ্যন্ত ঢেকেও / সুচতুর শৃঙ্খলের / ঝনৎকার লুকোনো যায় না। / উদ্ধার শুনেছি ঢের— / ভাগবত পরম করুণা / পাপীতাপী পতিতেরে / ত্রাণ করে নির্বিচার প্রেমে /

সে স্বর্গীয় সমাধান / হেসে ঠেলে রেখে।' [মানুষের মাপ' / নতুন কবিতা, সমগ্র কবিতা, গ্রন্থালয় সং] সত্যি হিসেব মেলে না, মেলানো যায় না। সব মাপ উপহাসে রূপান্তরিত হয়। মায়াবাদীরাও জীবনকে কুহেলিকাময় ভেবেও তা বিচারে উত্তীর্ণ হয় না। কবিতার শেষ পর্যায়ে এসে পাপী মানুষকে উদ্ধার করার জন্যে যে পরম ভাগবত প্রেমের আবির্ভাব ঘটে, তাতে স্বর্গীয় সমাধান অপ্রধান হয়, সাধারণ প্রেমেই তার উত্তরণ হয়।

মানুষের 'মানে' অন্বেষণ করতে গিয়ে যে কবি অচিন্ত্য সেনগুপ্তকে লিখেছিলেন, 'মানুষ যে বড্ড বড়, সে যে ধারণাতীত সে যে সুধীর চৌধুরী যা বলতে গিয়ে বলতে না পেরে বলে ফেললে—ভয়ংকর—তাই। তাই তার সব ভয়ংকর, তার আনন্দ ভয়ংকর, তার দুঃখ ভয়ংকর, তার স্খলন তার সাধনা ভয়ংকর। তাই একবার বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে যাই যখন তার সাধনার দিকে তাকাই, তার আনন্দের দিকে তাকাই, তার স্খলনের দিকে তাকাই। আর শেষকালে কিছু বুঝতে না পেরে বলি—ধন্য ধন্য ধন্য।

কাল এখানে চমৎকার জ্যোৎস্না রাত ছিল। সে বর্ণনা করা যায় না। মনের মধ্যে সে একটা অনুভূতি শুধু। ভগবানের বীণায় নব নব সুর বাজছে—কালকের জ্যোৎস্না রাতের সুর বাজছিল আমাদের প্রাণের তারে, তার সাড়া পাচ্ছিলুম। তারাগুলো আকাশে ঠিক মনে হচ্ছিল সুরের ফিনকি আর পথটা তন্দ্রা, পাতলা তন্দ্রা, আকাশটা স্বপ্ন। এক মুহূর্তে মনের ভেতর দিয়ে সুরের ঝিলিক হেনে দিয়ে গেল, বুঝলুম, ভয় মিথ্যা হতাশা মিথ্যা মৃত্যু মিথ্যা। সত্যি আমায় বিশ্বাস করতে হবে, প্রমাণ করতে হবে আমার জীবন দিয়ে। বলেছিলুম প্রিয়া অচেনা, আজ দেখছি আমি যে আমার অচেনা। প্রিয়া যে আমিই। এক অচেনা দেহে, আর এক অচেনা দেহের বাইরে। স্থূল জগতে একদিন আদিপ্রাণ—Protoplasm —নিজেকে দুভাগ করেছিল। সেই দুভাগই যে আমরা! আমরা কি ভিন্ন। আমি, পৃথিবী, প্রিয়া আকাশ—আমরা যে এক। এই একেকে আমায় চিনতে হবে আমার নিজের মাঝে আর তার মাঝে। এই চেনার সাধনা অন্তহীন তপস্যা হচ্ছে মানুষের। সেই চেনার কি আর শেষ আছে? একদিন জানতুম আমি রক্ত মানুষের মানুষ, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভরা আর প্রিয়া দেহ সুখের উপাদান—তারপর চিনছি আর চিনছি। আজ চিনতে চিনতে কোথায় এসে পৌঁছেছি, তবু কি আনন্দের শেষ আছে! আমার আমি কি অপরূপ' কি বিস্ময়কর! এই চেনার পথে কত রৌদ্র কত ছায়া কত ঝড় কত বৃষ্টি কত নদী কত পর্বত কত অরণ্য কত বাধা কত বিঘ্ন কত বিপথ

কত অপথ।' [১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে লেখা বটতলা বাড়ি পাথর চাপাটি, মধুপুর থেকে লেখা]।

'কালিকলম' ১৩৩৩ বৈশাখ সংখ্যার 'মানে' কবিতার সঙ্গে অচিন্ত্য সেনগুপ্তকে লেখা পত্রের বিষয়বস্তুর কত পার্থক্য। পত্রে যে রোম্যান্টিকতা লক্ষ্য করা যায়, কবিতায় তা রোম্যান্টিক বাস্তবতায় (Romantic Realism) পরিণতি লাভ করেছে। মানুষের মানে অন্বেষণ করতে গিয়ে যখন কবি দেহ সুখটাকে গুরুত্ব দেননি, তখন বোঝা যায় যে আরো অনেক নতুন কথা তাঁর কলম থেকে তাঁর দর্শন থেকে শোনা যাবে। শোনা গেল এই কবিতায় মানুষের সার্বিক বিশ্লেষণ। তার বিশেষ্য তার বিশেষণ সবকিছুর। 'রক্তমাংস হাড় মেদ মজ্জা' / ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম হিংসা সমেত— / গোটা মানুষের মানে চাই।' এতদিন এসব নিয়ে মানুষের বিশ্লেষণ ভাবা হয়নি ভাবা হয়নি বলেই আর দোষ না হয় গুণই বিচারের মাপকাঠি হতো। তাই কাফ্রী-ক্রীতদাস, হারেমের খোজা, বা ল্যাংড়া তৈমুর, বা নৃশংস এ্যাটিলা বা বুদ্ধ-খৃষ্ট—এঁরা সকলেই মানুষ। কিন্তু কাফ্রী-ক্রীতদাসকে মানুষ ভাবা হোত না একদিন। সমাজভর্তাদের শাসন-শোষণের বলি যারা তারা কখনই মনুষ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেত না। তাই 'অমৃতের পুত্র' যদি সকলে হয়, খৃষ্ট, বুদ্ধ, ক্রীতদাস বা নীচতম ব্যক্তিও মান্য। তাহলে মানুষের দোষটাই যেন বড় না হয়, তার অন্তরের অন্তরতম গহনে প্রবেশ করে তাকে চিনতে হবে, বুঝতে হবে—তবেই তার অস্তিত্বের সার্থকতা বোধ্য হয়ে উঠবে।

কবির 'গোটা মানুষের মানে' অন্বেষণের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো—মানুষ যখন সকলের মানে অন্বেষণ করে, তখন তার মানে কেন অস্পষ্ট হবে না ? ১৯২২ সালে লেখা চিঠির সঙ্গে মাত্র পাঁচ বছর পরের চিঠির পার্থক্য এমনভাবে দাঁড়িয়েছে যে এখানে রোম্যান্টিক কবি অনেক বেশী রিয়েলিস্টিক বাস্তবের হাসিকান্নার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। অবশ্য এই মানুষের ব্যাখ্যা তো মানুষই করবে। মানুষের মূল্যায়ন তো মানুষই করবে। তাই কবির মনে হয়েছে 'মানুষ কি তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিধাতার নিজের জিজ্ঞাসা ? / তাই কি মহাকালের পাতায় তার অর্থ কেবলি লেখা আর মোছা চলছে ?'

অসার্থ মানুষের মূল্যায়ন করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে মানুষের বিইং থেকে বিকামিং এর দিকে এগিয়ে চলার সময়, বিকাশের সুযোগে তার অর্থ ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে, সে ধীরে ধীরে এক-একটি বলয় ভেঙে নবতর বলয়ের সূচনা করছে—'শুধু বওয়া—/ অবিরত অনিয়ত হওয়া' ['বহতা' / অথবা কিম্বা] এই অনিয়ত হওয়ার ওপরই মানুষের মানে দাঁড়িয়ে আছে। তাই 'গোটা মানুষের মানে' এত জরুরী।

সাম্রাজ্যবাদিতা ও যন্ত্র সভ্যতার প্রতি ঘৃণা ঃ বাঘের কপিশ চোখে, ফেরারী ফৌজ, হরিণ-চিতা-চিল

এই যন্ত্রসভ্যতার ক্রোড়ে লালিত মানবসমাজের মধ্যে আরণ্য আদিমতার নির্মিত প্রতিমা বাঘের কপিশ চোখ। বাঘ এক হিংস্রপ্রাণী এবং তার কপিশ চোখে যে ছায়াপাত ঘটবে তা আরণ্য রঙীন। 'কপিশ' শব্দের আভিধানিক অর্থ নীলপীতমিশ্রিত একটা রঙ যা পাংশুল এই রঙের মধ্যেই 'জংগলের' ছায়াপাত ঘটেছে, আর এই ছায়া তো আজকের পৃথিবীর যন্ত্র সভ্যতার ছায়া - যা একটা ক্লেদ সৃষ্টি করছে। মানুষ আরণ্য আদিমতায় 'নবমৃত্যু' সৃষ্টি করেছে, যার পূর্ণান্বিত অভিব্যক্তি। বাঘের কপিশ চোখ কবি চেতনায় একদিকে মনুষ্য সমাজের যেমন সুখ দুঃখ হাসি-কান্না মেশানো একটা উদার রূপ উঁকি দেয়, তেমনি যন্ত্রসভ্যতা যে মানুষকে আজ একটা অনিকেত (Rootlessness) অবস্থায় নিয়ে গেছে অকস্মাৎ 'হাই তুলে', 'গড়াগড়ি' দেওয়ার ভাবাণুষঙ্গে তা প্রতিভাত হয়েছে।

গরাদের ওধারে শুয়ে থাকা বাঘের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তাতে তার ১. মাঝে মাঝে চেয়ে দেখা অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্নের মতো ২. তীব্র নর-মাংস ঘ্রাণ ৩. হাইতোলা, গড়াগড়ি দেওয়া ৪. তার চোখে টেরাই-র জঙ্গলের ছবি।

অন্যদিকে গরাদের এধারে এক আশ্চর্য যান্ত্রিক জগৎ যেখানে উদ্ভিদের নিঃশব্দ সংগ্রাম কাটায় কাটায় দ্বন্দ্ব, লতিকার মৃত্যু আলিঙ্গনে মহীরুহের রুদ্ধশ্বাস, শিশুতরুর আকাশ না পাওয়ার ব্যথা, বনস্পতির সঙ্গে দয়াহীন মৃত্যুর সংগ্রাম, কটুগন্ধ বাষ্পভারে মূর্চ্ছিত আকাশ।

কবিতা একটি ভিন্নচিত্র উন্মাটিত। তা হলো গরাদের ওপারের বাঘ তার হিংস্র মূর্তি ভুলে গিয়ে হাই তুলে অকস্মাৎ গড়াগড়ি দেয়। বাঘের এই দুর্বল প্রতিমা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে সে শৃংখলিত, তার দুর্দান্ত রূপটা আর আমাদের জন্যে নয়, সে পরাজিত মানুষের কাছে, সে পরাজিত বুদ্ধির কাছে। সাম্রাজ্যবাদিতার এটাই আসলরূপ। সে যখন

জনগণের আন্দোলনের শৃংখলে শৃংখলিত, তখনই তার আর আক্রোশ বা গর্জন দেখিয়ে কোন লাভ নেই। এটা সাম্রাজ্যবাদীদের জানা। তারা চুপ থেকে ভিন্ন কৌশলের দিকে ছোটে।

কিন্তু এই সঙ্গে মানুষ যখন বন কেটে বসত নির্মাণ করে, যখন নাগরিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে, তখনই অনেক প্রাচীন, অনেক শৃংখল এই জীবনকে বেঁধে রাখতে চায়। ফলে মানুষের মনের যে স্বাভাবিক বিকাশ তা ব্যাহত হয়। তাই নাগরিক জীবনের স্বতঃপ্রণোদিত বিকাশ খুব কম ঘটে। এ জীবনের মধ্যে যেন একটা আড়ষ্টতা, একটা বন্ধন থাকেই। আর মানুষ ইঁটের পরে ইঁট সাজিয়ে যেন 'কীট' তৈরী হয়ে যায়। ফলে কবি কথিত এক অন্য অরণ্য রচিত হয় যাতে 'নবমৃত্যু'র উদ্ভাবন স্পষ্ট হয়।

আধুনিক যন্ত্র লালিত সভ্যতার তিনটি রূপ কবির কাছে ধরা পড়েছে। এবং তা তিনটি বাক্-প্রতিমায় বিবৃত হয়েছে।

১. হরিণ ২. চিতা এবং ৩. চিল।

'হরিণ' প্রতিমা ক্ষীপ্রতার প্রতীক। আজকের সভ্যতা ক্ষীপ্রতা এনে দিয়েছে মানুষকে, কেড়ে নিয়েছে তার হৃদয়। 'চিতা' প্রতিমা লালসা-উন্মত্ত সাম্রাজ্যবাদীর প্রতীক। তারা অন্ধকারের রাজত্ব স্থাপন করতে চায়। আর তৃতীয়ত 'চিল' দূর থেকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সবকিছু জানতে বা বুঝতে চাইবে। গবেষকের চিত্র 'চিল' প্রতিমায় ধরা পড়েছে।

বিজ্ঞান বা যন্ত্র অধ্যুষিত সমাজে আজ মানুষ বেগকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছে, আবেগকে সরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এই ক্ষীপ্রতাও কাঙ্ক্ষিত নয়, সমাজের মানুষকে এরকম পঙ্গু অবস্থায় নিয়ে যেতে চাওয়া—এই 'হরিণ' প্রতিমায় আঁকা হয়েছে। কারণ হরিণকে জাদুঘরে রেখে তার 'অবোধ চাউনি বরফে' জমানো রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে 'চিতা' যা হিংসায় উন্মত্ত তাকেও জাদুঘরে রাখা হচ্ছে, সুতরাং তোমার হিংস্র উল্লাসও আর থাকবে না। চিতার সেই স্বাধীনতার ওপর বিরাট শাসন জারি করা হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী মানুষও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের আন্দোলনের কাছে স্তিমিত হয়ে যায়।

'চিল' যেমন দূরে আকাশে উঠে নদীর বুকে সচ্ছলতায় পণ্যবহন দেখবে, তেমনি নীড় খোজার জন্যে আবার তাকে সীমায় আসতে হয়। যদিও 'স্বাস্তর উচ্ছিষ্ট' ছোঁ মেরে নিতে হয়, তবুও প্রত্নপালির সাত-পুরু ভাজ ফুঁড়ে শুধুই কি জীবাশ্ম পায়? ইতিহাসও সে পেয়ে যায়।

এই দৃষ্টিতে গবেষকগণও দূরে নিকটে থেকে জীবন-সমাজ ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে চলে—অগ্নিগর্ভ যুগের কাহিনী নিচয়ে তাদের কাছে অভিপ্রেত

হয়ে দেখা দেয় আর তাঁদের গবেষণার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের সব কথাই জানা হয়ে যায়।

অথচ মানুষ এই হরিণ-চিন্তা-চিল থেকে সরে সরে যায়। সরতে সরতে এমন অবস্থায় গিয়ে পেঁছয় যে তার পিঠ দেওয়ালে ঠেকে যায়। সে দেখে একদিকে তার সামনে অনন্ত পথ যে পথে সে 'প্রথমা'র যুগে শুনেছিল 'যে মানুষ পথ সৃষ্টি করেছে, / মানুষের সঙ্গে মেশবার পথ! / অরণ্যে পথ আছে। / শ্বাপদেরা যে পথ দিনের পর দিন, যুগের পরে যুগ / তৈরী করেছে বন মাড়িয়ে মাড়িয়ে / শিকারের চেষ্টায় আর জলের অন্বেষণে / - মৃত্ত তৃণের পথ' [রাস্তা] কিন্তু এখন সেই বন কেটে বসত তৈরী হচ্ছে, সেই সবুজিমা আর নেই—তা লাঙলে কুড়ুলে ভ্রষ্টা।

এ হেন একটা পরিবেশ থেকে কবি মুক্তি চান, সাধারণ মানুষও মুক্তি চায়। কিন্তু পালাতে পালাতে কতদূরে?' এই প্রশ্ন কবিতার প্রথমে আর শেষেও জিজ্ঞাসা। অগ্নিগর্ভ গহ্বর সব বোজানো?' এর উত্তর নিঃসন্দেহে অস্ত্যর্থক নয় নঞর্থক। পালানো যাবে না সভ্যতার এই অনভিপ্রেত পরিবেশ থেকে মুক্তি নেই আর অগ্নিগর্ভ গহ্বর সব এখনো উন্মুক্ত। এসবের থেকে মুক্তির জন্যে সূর্যসেনা বা ফেরারী ফৌজের আগমনই কবির প্রত্যাশা।

সমাজের শুধু এই অসহনীয় অবস্থার অবসানের জন্যে নয়, সর্বপ্রকার অসাম্য, অন্যায় আর অন্ধকার দূর করার জন্যে এক বিশেষ 'প্রতিমা' ব্যবহার করেছেন। সেই প্রতিমা 'ফেরারী ফৌজ'। 'প্রথমা'র যুগে নিজেকে অভিশপ্ত মনে করেননি কবি প্রেমেন্দ্র। সে যুগে তিনি নিযুক্ত-জীবনের কান্না শুনে ঘোষণা করেছিলেন। হে প্রহরী, হানো অসি নিশার মরমে,--/ যুগ যুগান্তের এই সঞ্চিত আঁধার কেটে যাক্‌-- / বেদনার উষ্ণ রক্তধারে; / রক্ত পারাবার হতে উদ্বোধন হোক আজ নূতন উষার। 'দ্বার খোল' অবশ্য 'প্রহরী' প্রতিমাকে মানুষের অন্তর্লীন সত্তা বা জাগ্রত বিবেক কল্পনা করা যায় তাহলে তা কিন্তু 'সম্রাট'-এর পর্বে এসে পুরোপুরি 'অবতার'-এ রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। কবি বলেছেন, 'লোভ, হিংসা, ঘৃণার তাণ্ডবে, / মৃত্যু-গাঢ় অন্ধকারে /·· জ্যোতিষ্মান অবতার / দেখা দেবে কি নূতন বেশে /, তারই ছবি' / ভাবে বসি অভিশপ্ত মানুষের কবি।' ['অবতারণা'] মানুষ অভিশপ্ত হয়ে গিয়েছে—তাই তার কবি হিসেবে সম্পূর্ণ নবরূপ আনার জন্যে শ্রীমদ্ভাগবদগীতার শ্লোক যেন তুলেছেন···পরিত্রাণায় সাধূনাং বনাশায়চ দুষ্কৃতাং ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে' [চতুর্থ অধ্যায় / ৮]। ঠিক এই মুহূর্তে কবি আর সংশয়বাদী নন, তিনি এ প্রসঙ্গে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছেন।

কখনো এই 'প্রহরী', জ্যোতিষ্মান অবতার' 'ফেরারী ফৌজ' 'সূর্য সেনা', 'আবার 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যে এসে 'সূর্যবীজ' বা 'সংশপ্তক বাহিনী'। কবি 'সাগর থেকে ফেরা' পর্বে জানালেন, 'এই অকিঞ্চন পৃথিবীর মৃত্তিকায় / যে সূর্য-বীজ তুমি রোপণ করো / তা ব্যর্থ হবার নয়। / মোহাচ্ছন্ন বর্তমানের সমস্ত কুজ্ঝটিকা অতিক্রম করে, / সুদূর যুগান্তে তার সংকেত প্রসারিত। / মানবতার গভীর উৎস-মূলে / অক্ষয় তার প্রেরণা' ['সূর্যবীজ']

'ফেরারী ফৌজ'-এ এসে কবির প্রতিমার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। শুধু ব্যঞ্জনায় বিস্তৃতি ঘটেছে। কবি রাত্রির সাম্রাজ্যে আজো যারা সন্তর্পণে ঘোরা ফেরা করে এক শাশ্বত আলোর বার্তা ছড়িয়ে দেবার জন্যেই। কিন্তু সেইসব সূর্যসেনা এখনও পলাতক। তারা ফেরারী। 'গাঢ় কুজ্ঝটিকা এসে / মুছে দিয়ে গেছে সবপথ ; / ভয়ের তুফান তোলা রাত্রির ভ্রূকুটি / হেনেছে হিংসার বজ্র। / দিগ্বিদিক - ভোলানো আঁধারে / কে কোথায় গিয়েছে হারিয়ে। রাত্রির সাম্রাজ্য তাই এখনো অটুট। / ছড়ানো সূর্যের কণা জড়ো করে যারা / জ্বালাবে নতুন দিন, / তারা আজো পলাতক, / দলছাড়া ঘুরে ফেরে দেশে আর কালে'। কিন্তু কবিতো আশাবাদী। তাঁর আশা 'তবু সূর্যকণা বুঝি হারাবার নয়। / থেকে থেকে জ্বলে ওঠে শাণিত বিদ্যুৎ / কতমান শতাব্দীর প্রহর বাঁধিয়ে / কোথা কোন্ লুকানো কৃপাণে / ফেরারী সেনার।' সুতরাং এবার ফেরারী ফৌজের অজ্ঞাতবাসের অবসান ঘটবে—ফৌজদার হেঁকে যায় ; 'আনো সব সূর্যকণা / রাত্রি-মোছা চক্রান্তের প্রকাশ্য প্রান্তরে।'

যুগে যুগে নীলনদতট থেকে হোয়াংহো তীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় যুদ্ধ ঘটেছে আদর্শের সঙ্গে অনাদর্শের, অন্ধকারের সঙ্গে আলোকের। রাত্রির সাম্রাজ্যে তাই ফেরারী ফৌজ ঘোরা ফেরা করেছে, আর জানিয়ে দিয়েছে সূর্য-কণা সংগ্রহ করে সূর্যসেনা আসবে আর আলোকোজ্জ্বল দিন রচনা করবে। এখানে কটি প্রতিমা লক্ষ্য করার মতো। সূর্যকণা তিল তিল করে বয়ে নিয়ে যেতে হবে 'রাত্রির শাসন-ভাঙা ভয়ঙ্কর চক্রান্তের গুপ্তচর রূপে'। আর একাজ পারে সূর্য-সেনারাই অর্থাৎ বিপ্লবীরা। দ্বিতীয় 'দুরাশার তুরঙ্গে সওয়ার / দুর্গম যুগান্তমরু পার হবে বলে' এক ঘোড়-সওয়ারের চিত্র। তৃতীয় 'ভয়ের তুফান তোলা রাত্রির ভ্রূকুটি' শব্দ বন্ধে রাত্রিকে 'মহাসাগর' প্রতিমায় চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই 'ভয়' তুফান হিসেবে তার অনুষঙ্গের কাজ করেছে। আবার 'হিংসার বজ্র' শব্দ প্রয়োগে রাত্রি'কে 'বজ্র' দিয়ে হননকারী কোন দৈত্য প্রতিমায় চিত্রিত করা হয়েছে।

সত্তার যন্ত্রণা ও 'নাম এবং মুখ'

এ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিকস্'-এর চতুর্থ পর্যায়ে অনুকরণ করার প্রবৃত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জানালেন, যে সমস্ত বিষয়গুলির স্বরূপ দেখে আমরা বেদনা অনুভব করি, সেই বিষয়গুলির অবিকলভাবে উপস্থাপিত রূপের কথা চিন্তা করে আমরা আনন্দ লাভ করি।' অর্থাৎ সৃষ্টির উৎসমূলে 'বেদনা' বা যন্ত্রণা'র কথা প্রথমেই আসে আর আসে বলেই সেই যন্ত্রণাকে বাদ দেওয়া যায় না। মাতৃগর্ভ থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে যে যন্ত্রণা মাতা ভোগ করেন তা সকলেরই বিদিত, এবং তার পরে সৃষ্টির সূর্যালোকে আলোকিত দিগন্ত আর ঠিক সেই মুহূর্তে স্রষ্টার সব যন্ত্রণার অবসান, যেমন মাতার। কবি বা শিল্পীর এই যন্ত্রণার ভিত্তিভূমি 'সত্তা'। এবং সেই সত্তার পরিকাঠামো যে সমকালীন ব্যক্তি মানুষ আর সমাজ-মানুষের নির্যাসে [Essence] রচিত একটি চিরকালীন আধুনিকরূপ। এই সত্তার নানান জিজ্ঞাসা। নানা প্রশ্নে জর্জরিত সত্তা কখনো কখনো নিজস্ব পরিচয় অন্বেষণ করতে গিয়ে আকুল হয়ে পড়ে। কে সে? কোথা থেকে তার আসা? কোথায় তার গতি? ঔপনিষদিক সেই চিরন্তন জিজ্ঞাসাও আধুনিকতার নামাবলি গায়ে দিয়ে এগিয়ে আসে, 'কস্তম্? কুত সমায়াতঃ? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যে তার উদ্বেলিত হৃদয়ের যন্ত্রণার শেষ নেই। আর এই সত্তার যন্ত্রণা তো শুধুমাত্র তার অস্তিত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন নয়, এই যন্ত্রণা থেকেই তার সৃষ্টির নব নব উদ্ভাসন। সে উদ্ভাবন করে তার সুরূপ কুরূপ তার প্রেম-অপ্রেম, জানতে পারে ব্রুটাসের মতো বন্ধুও শত্রুর ভূমিকা নেয়, তখনই তার চৈতন্যের নবতর বিন্যাস ঘটে যায়। অর্থাৎ সেই এ্যারিস্টটলের কথায় বেদনা অনুভবের মধ্যে জ্ঞান লাভ আর শেষ পর্যন্ত জ্ঞান লাভ থেকে আনন্দ লাভে উত্তরণই কাম্য রূপ নিয়ে সৃষ্টির ক্ষেত্রে সে আবির্ভূত হয়। এই ব্যাপারটা তাবৎ যে কোন কবি-শিল্পীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনের 'একটি কবিতা'য় তাঁর এই সত্তার যন্ত্রণার কথা জানিয়েছিলেন। কবিতাটি বিশ্লেষণ করা যাক ঃ

'প্রথম দিনের সূর্য' / প্রশ্ন করেছিল / সত্তার নূতন আবির্ভাবে কে তুমি। / মেলেনি উত্তর। / বৎসর বৎসর চলে গেল, / দিবসের শেষ সূর্য' / শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিমসাগরতীরে, / নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—/ কে তুমি। / পেল না উত্তর।' [শেষ লেখা, ১৩নং] সারাজীবন ধরে কবি তাঁর সত্তার পরিচয় জানার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন - কিন্তু সে পরিচয় তাঁর অজ্ঞাতই থেকে গেল, জীবন-সায়াহ্নে এসেও তার উত্তর পেলেন না। যদি মনে করা যায় এই পরিচয়হীনতার একমাত্র কারণ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোদুলদোলায় মানুষের সত্তা যে বিচলিত, ব্যক্তি মানুষের সত্তা যে সমাজসত্তায় লীন আর তার নিজেকে পৃথক করে খুঁজে পাওয়ার কথা যে নয়, তবুও কেন এই কান্না? তবুও কেন পৃথক করে নিজেকে খোঁজা, নিজেকে অবলোকন করার মানসিকতাকে কবি রবীন্দ্রনাথ যেমন অস্বীকার করেননি তেমনি প্রেমেন্দ্রও। মৃত্যুর কয়েকমাস আগে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন হঠাৎ যে তিনি নিজের রূপ চিনে ফেলেছেন। লিখলেন, 'রূপনারাণের কূলে / জেগে উঠিলাম, / জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়। / রক্তের অক্ষরে দেখিলাম / আপনার রূপ, / চিনিলাম আপনারে / আঘাতে আঘাতে / বেদনায় বেদনায়; / সত্য যে কঠিন, / কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, / সে কখনো করে না বঞ্চনা। / আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন, / সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে, / মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।' [১১নং 'শেষ লেখা'] কবি নিঃসন্দেহে সত্তার একটা ক্ষতবিক্ষত রূপ দেখেছিলেন, এবং মোটামুটি নিশ্চিন্ত ছিলেন, কারণ তিনি জানতেন আমৃত্যু দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়েই জীবনের শাশ্বত সৃজন মাহাত্ম্য। এসব জেনেও কিন্তু এর মাত্র মাস দুই পরে লেখা ১৩নং কবিতায় নিজেকে আবিষ্কার করতে পারছেন না এবং অবিরত এই একটার পর একটা প্রলয় সৃষ্টি করে তাকে ভেঙে ভেঙে নতুন কল্পের দিকে অভিযাত্রা, সেখানেও স্থিতি নেই এভাবে যন্ত্রণার গর্ভ থেকে সৃষ্টি সূর্যোদয়।

প্রাসঙ্গিকভাবে আধুনিক বাংলা কবিতার অগ্রণী কবির 'নাম', ['কখনো মেঘ' কাবতাটিতে কবি রবীন্দ্রনাথকে মীথে রূপান্তর করে এক অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নাম' কবিতায় একটি বিশেষ বাক্‌-প্রতিমা হিসেবে দাঁড়িয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি এমন একটি প্রতিমায় রূপান্তরিত করেছেন, যাঁর কাছে মানুষের সবপ্রশ্নের মীমাংসা খুঁজে পাওয়া যাবে। আজ দীর্ণ সমাজের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে, জীবনযন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে মানুষ বিশ্বাসে অবিশ্বাসে টাল খেতে খেতে, ভালবাসা আর বিরাগের রঞ্জিত আর জর্জরিত হতে হতে মানুষ চলেছে এক অতি

আকাঙ্ক্ষিত সূর্য-তোরণের দিকে আর সেক্ষেত্রে সেই সূর্য কবির কাছে 'রবীন্দ্রঠাকুর।'

ঠিক এই আলোচনা শুরু করার প্রাক্-মুহূর্তে প্রাসঙ্গিকভাবেই কবি শঙ্খ ঘোষের একটি উচ্চারণ আমাদের কত সুন্দরভাবে প্রাণিত করে দেয়—'রবীন্দ্রনাথ একসময় যেমন ভাবতে পারতেন যে বিশ্ব চলছে কোনো মহত্তর পরিণামের দিকে, আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো তেমন করে ভাবতে পারি না।' ['বিশ্বাস অবিশ্বাস / জার্নাল'] সেইজন্যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে বিস্ময় এবং শাশ্বত প্রতিমা। প্রেমেন্দ্রের কাছেও। দ্বিতীয়ত, কবি শঙ্খ ঐ একই প্রবন্ধে এই ব্যথার কালভূমিতে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাস থেকে, ভয়ংকর শূন্যতা থেকে প্রেমের সৃষ্টি ঘটে তাও উল্লেখ করতে ভোলেননি। তিনি লিখলেন, 'ভয়ংকর শূন্যের মধ্যে আঁকড়ে থাকা এই ভালোবাসা কি সুন্দর নয়? তাই অবিশ্বাস মানেই অপ্রেম নয়। বরং অবিশ্বাসই জন্ম দিতে পারে সবচেয়ে বড়ো ভালোবাসার'। এই সূত্রে আজ এই অবিশ্বাস-সংশয়-দোদুল্যমানতা আর হাহাকারের মাঝে আশ্রয়-স্থল একমাত্র রবীন্দ্রঠাকুর—যিনি নিজে সত্তার যন্ত্রণায় কাতর হয়েও নির্দিষ্টভাবে সৃষ্টির ফুল ফোটাতে ফোটাতে চলেছিলেন—অপরের কাছে নিজেকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেই। কবিতাটির পূর্ণরূপ ঃ

'সবকথা স্তব্ধ হলে / দেখি এক পবিত্র যন্ত্রণা / সৃষ্টিমূল থেকে তরঙ্গিত / সময়ের শূন্যপটে / এঁকে যায় জ্বলন্ত বিস্ময়। / আনন্দাৎ এব খল্বিমানি—জেনেও তা রক্তাক্ত সংশয়। / নিজেকে তা মাটিতেই বাঁধে / কথা সুর ছবি হয়ে / সকলের সাথে হাসে কাঁদে। / তবু অনির্বাণ / সত্তার অতৃপ্ত প্রশ্ন বিদ্রোহের যন্ত্রণাবিধুর / উদ্‌ভ্রান্ত বিক্ষুব্ধ যুগে কখনো হয়তো / নাম নেয় রবীন্দ্রঠাকুর।'

এখানে 'পবিত্র যন্ত্রণা', 'সময়ের শূন্যপট', 'জ্বলন্ত বিস্ময়', 'আনন্দাৎ এব খল্বিমানি', রক্তাক্ত সংশয় 'অতৃপ্ত প্রশ্ন', 'বিদ্রোহের যন্ত্রণাবিধুর', উদ্‌-ভ্রান্ত বিক্ষুব্ধযুগ' এই শব্দবন্ধে এমন এক কালচেতনার সঙ্গে শাশ্বত চেতনার সংশ্লেষ ঘটালেন কবি তাতো রবীন্দ্রঠাকুরকে মীথ শুধু নয় প্রতিমা হিসেবে চিহ্নিত করার জন্যেই। কারণ একটা অগ্নিগর্ভ পরিবেশে জীবনের সুন্দরতম শান্তির জন্যেই রবীন্দ্রনাথকে আকাঙ্ক্ষা কবির শুধু নয়, তাবৎ সব পাঠকের। হৃদয়ের সব তোলপাড় যখন স্তব্ধ হয়, যখন চাওয়া-পাওয়ার প্রশ্ন থাকে না, যখন শুধু সৃষ্টিরই যন্ত্রণার উপলব্ধি ঘটে। সময় ধাবমান। গতিশীল এই সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আঁকা হয়ে যায় মহাকালের শূন্য

ক্যানভাসে এক অনাদ্য প্রতিমা। যন্ত্রণা তো পবিত্র বটেই। কারণ মাতৃ-জঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে সন্তান যেমন চোখ মেলে তাকায় মাতৃজঠরের সে যন্ত্রণার তুলনা নেই। পৃথিবী তথা মানব সৃষ্টির আর্কিটাইপ তাই যন্ত্রণাবিদ্ধ অন্ধকার। যদিও আনন্দই এই সৃষ্টির মূলকথা, তবুও এটাই সব নয়—চলার পথে তাই রক্তাক্ত সংশয় থেকে যায় এবং তখনই রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল উপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কবি রবীন্দ্রনাথ মাটির কাছা-কাছি এসে কখনো পৌঁছন, তখন তাঁর সে পরিবর্তন 'কথা', 'সুর', আর 'ছবি'র প্রতিমায়। রবীন্দ্রনাথের এই সব বিমূর্ত (abstruct) প্রতিমা সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাই মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সকলের সঙ্গে তাই হাসি-কান্নার শরিক হয়ে যায়। কিন্তু এটাই তো সব নয়—রবীন্দ্রনাথের কবিতা গল্প উপন্যাস নাটকের কথা, গান বা চিত্রমালাই মানুষের অন্তরের অতৃপ্ত জ্বালার উপশম ঘটাবে—এর ওপরেও মানুষের সেই সত্তার যন্ত্রণার সাথে 'বিদ্রোহের যন্ত্রণাবিধুর উদ্‌ভ্রান্ত বিক্ষুব্ধ যুগে' রবীন্দ্রনাথ মানুষের প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথের রচনাই ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ভারত, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পাঠ্য। রবীন্দ্র-কবিতাই তাবৎ সব স্বাধীনতার জন্যে মৃত্যুবরণের পূর্ব লগ্নে চিরঞ্জীব সৈনিকরা আবৃত্তি করেছেন। তাঁর সেই 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই / নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই' এই জাতীয় কত কবিতা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জাগিয়ে তুলেছে। শুধু তো স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়, বিংশ শতাব্দীর নানা যন্ত্রণায় বিক্ষুব্ধ অবস্থায় একমাত্র আশ্রয়স্থল রবীন্দ্রনাথই। তাই যখন আর কোন কথা নেই, আর কোন আশ্রয় মানুষ পায় না, আর কোন উপায় মানুষের সামনে থাকে না, তখনই একটি সত্তার যন্ত্রণা—যা নিঃসন্দেহে 'পবিত্র'—কেননা সেই যন্ত্রণা থেকে সৃষ্টির বাণী ধ্বনিত হবে—। সমকালীন এই বিক্ষোভ, সময়ের শূন্যপট, জ্বলন্ত বিস্ময়, রক্তাক্ত সংশয় অতৃপ্ত প্রশ্ন, বিদ্রোহের যন্ত্রণা আর উদ্‌ভ্রান্ত বিক্ষোভ থেকেই তো সত্য সৃষ্টি হবে। তাইতো রবীন্দ্রনাথের নিজেরই প্রার্থনা: 'সৃষ্টিলীলা প্রাঙ্গনের প্রান্তে দাঁড়াইয়া / দেখি ক্ষণে ক্ষণে / তমসের পরপার / যেথা মহা-অব্যক্তের অসীম চৈতন্যে ছিনু লীন। / আজি এ প্রভাতকালে ঋষিবাক্য জাগে মোর মনে। / করো করো অপাবৃত হে সূর্য, আলোক-আবরণ, / তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি / আপনার আত্মার স্বরূপ।' ['জন্মদিনে' ১০নং কবিতা] অন্ধকারই যন্ত্রণার স্বরূপ। তাই সে ক্ষেত্রেই যে কোন সৃষ্টিধর্মী সান্ত্বনা আশ্রয়ই রবীন্দ্রনাথের নাম নিয়ে মানুষের কাছে দাঁড়ায়।

এই যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি বীজমন্ত্র উচ্চারিত হলে কখনো রবীন্দ্রনাথ আমাদের সত্তার গহনে প্রভাব ফেলে দাঁড়ান। আবার রবীন্দ্রনাথ যেমন সত্তার যন্ত্রণার তাগিদে মানুষের 'চির সাথী', তেমনি জীবনের ভিন্ন পর্বে ভিন্ন অবস্থায় মানুষকে এক 'মুখ'ই চালিত করে প্রাণিত করে—যা কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মুখ' ['অথবা কিন্নর'] প্রতিমায় ধরা পড়েছে। কবি লিখেছেন,

'একটা মুখ কাঁদায় হয়ে শীতের রাতে পথে অনাথ শিশু, মেলায় বাজি-করের খেলায় একটা মুখ মুখোস পরে হাসায়। খেয়ার নায়ে ওপারে যেতে কবে যে কোন ভিড়ে / একটা মুখ এক নিমেষে অকূল স্রোতে ভাসায়! / কার সে মুখ, কার? জানে কি তারা ছিটোন অন্ধকার!'

এই দর্শনবেদী মূর্ত প্রতিমা 'মুখ' কবির কাছে কিন্তু বিমূর্ত হিসেবেই ধরা দিয়েছে। যে মুখ অনাথশিশুর মধ্যে মূর্ত সেই মুখই তো বিশ্ব-স্রষ্টার, সেই মুখই কবি-শিল্পী সাহিত্যিকের কাছে প্রাণেশ্বরী পরমা যন্ত্রণার। অর্থাৎ 'প্রথমা'র যুগে যে 'দেবতার জন্ম হোল' কবিতায় বলেছিলেন, 'দেবতার জন্ম হ'ল। / দেবতার জন্ম হ'ল, সুপবিত্র সুন্দর প্রভাতে / মাটির কোলের 'পরে—/ মার বুকে, / বিধাতার আশীর্বাদ লয়ে। / এমনি আমার ভগবান / বার বার জন্ম ল'ন মার বুকে / সুপবিত্র ধরণীর কোলে। / তারপর চেয়ে দেখি—/ কোথা মোর ভগবান? / জীর্ণ গৃহ, আবর্জনা চারিদিকে, / আর মাঝে আলোহীন বায়ুহীন কক্ষে, / ছিন্নশয্যা-পরে শুয়ে / রোগ রুক্ষ ক্ষুধা-ক্ষীণ দেহ লয়ে / দেবতা আমার। ফেলে দীর্ঘশ্বাস!' তখন দেখা গিয়েছিল দরিদ্র রুগ্নজীর্ণ শীর্ণ মানবই দেবতা অর্থাৎ দেবতা ও মানুষের মধ্যে একটা Juxtaposition বা Coincidence ঘটেগেছে। এই 'অথবা কিন্নর' পর্বে এসে সেই সংশ্লেষ নয় অন্য এক নবতর বিন্যাসে মানুষকে বা দেবতাকে দেখছেন। এই কবিতায় দর্শন চিন্তার অবশ্যই ভারতীয় ঐতিহ্য খুঁজে পাওয়া যাবে—যা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দুটি একটি ছত্রে দ্যুতিমান হয়ে উঠেছে। 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা'—এই বাক্যবন্ধে সেই সংশ্লেষই মূর্ত। ঔপনিষদিক—'আমি সেই' এই কথার সুর এখানেও ছড়িয়ে পড়েনি কি?

তাইতো কবির সিদ্ধান্ত এই যে সে মুখ যারা দেখেনি, তারা জানে না 'জ্বালা নিদান' নেই—শীতের দিনে উঠোনে বসে রোদ পোহায় আরামে কাঁথা গায়ে দিয়ে, ঝুমকোলতা দেয়ালে তুলে রাখে, মরাই ধানে ভরিয়ে দেয়, ফল অথবা ফুল পাড়ার জন্যে ডাল নামায়। আসলে তারা সংকীর্ণ স্বার্থেই পৃথিবীতে বেঁচে থাকে। সংকীর্ণ ভোগবাদে জীবন ব্যয় করে,

জীবনের তো সার্থকতা এভাবে নয়। যদি কোন মানুষ সেই 'মুখ' দেখতে পায়—তাহলে যে তার জন্ম সার্থক—তার পৃথিবীতে আসা মধুরতম-পর্যায়ে পৌঁছবে। যারা সে মুখ দেখেনি তাদের জীবনে 'ছোট-আমি'র বিস্তার, 'বড়ো-আমি'র বিস্তার ঘটেনি।

কারণ, সে মুখ যারা দেখেছে, সে বনে যায় না বটে, ঘরে থেকেও জীবন-ধর্ম পালন করেও সৃষ্টিধর্মী কাজে ব্যাপৃত থাকে। নিজে বৃহত্তর একটা জগৎ সৃষ্টি করতে পারে। তার হৃদয়ে উদ্ভূত এক যন্ত্রণাই তাকে নিয়ে আসে। সেই জন্যে কবির এই কবিতায় যে কয়েকটি চিত্র ও চিত্রকল্প শব্দের বুনোটে ধরা পড়েছে তা নিতান্তই সেই 'মুখ' চিত্রকল্পকে ঋদ্ধ করেছে।

১. জানে কি তারা ছিটোন অন্ধকার ২. অনিদ্র রাতে কাঁপে না অন্ধকার ৩. তবুও কোন হতাশ হাওয়া একটা ছেঁড়া ছায়া / তারার ছুঁচে সেলাই করে রাত্রি জুড়ে টাঙায়।

এখানেই 'ছায়া'র বাক্ প্রতিমাটি যে কার প্রতিমা তা কবি শেষ পংক্তিতে জানিয়ে দিয়েছেন, তা প্রাণেশ্বরী পরমা যন্ত্রণার। এই প্রাণেশ্বরী পরমা যন্ত্রণা'র ছায়ার প্রতিমা তৈরী করতে কবিকে একটি বিরাট ক্যানভাসের আশ্রয় নিতে হয়েছে যার ব্যাপকতা দিগন্ত বিস্তৃত। 'তারা' ছুঁচ, ছায়া যা 'ছেঁড়া' 'ছেঁড়া' হয়েছে—সেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন প্রাণের যন্ত্রণাবিধুর ছায়াকে তারার আলোকমালা দিয়ে সজ্জিত করে সারারাত্রি জুড়ে টাঙানোর মধ্য দিয়ে অন্ধ-কারের এক মাত্রা সংযোজিত করলেন কবি। এ এক অনবদ্য অন্ধকার—যেখানে তারার আলোকমালায় এক জীবন্ত বিস্ময় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটি একটি স্থানিক বা কালিক চিত্রও বলা যায়—যেখানে দর্জি হয়েছে 'হতাশ হাওয়া' আর 'ছেঁড়া ছায়া' কাপড়,' তারা' ছুঁচ, আর সেই ছেঁড়া ছায়ার বস্ত্রখানি দর্জি দিয়ে সেলাই করে রাত্রির এপার থেকে ওপার পর্যন্ত একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত বিস্তার ঘটিয়ে টাঙানো হয়েছে। জীবনের যন্ত্রণা তো একক নয়—হাজারো খণ্ড ক্ষুদ্র যন্ত্রণাকে যুক্ত করে যে বিরাট যন্ত্রণা। সেই বিরাট যন্ত্রণার গর্ভ থেকে সৃষ্টির মহামন্ত্র ধ্বনি শোনা যায়। আর সেই যন্ত্রণাকে কবি রূপ দান করেছে। 'প্রাণেশ্বরী পরমা' অভিধায়। এখানে সেই প্রাণেশ্বরী যন্ত্রণার ছায়া কবি ঐ অনাথ শিশুর মধ্যে দেখেছেন, দেখেছেন বাজিকরের মুখে—যা মুখোস পরেছে—অথবা পারঘাটের নায়ে এক হারিয়ে যাওয়া মুখে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কবির মনে এক অনবদ্য চিত্র ভেসে বেড়ায় এই কারণে যে ঐ একটিই মুখ— দুটি নয়—ঐ মুখই সারা

জীবনে এক নবতর উদ্ভাসন নিয়ে তাকে হাসায়, কাঁদায়, খেলায়, ভোলায় —আর তাতেই কবির সৃষ্টির প্রেরণা আসে—এবং ঠিক এর প্রাক্ পর্বে এক যন্ত্রণার ঢেউ ওঠে—এই ঢেউ না উঠলে ঐ 'মুখ' দেখে ক্ষুদ্রত্ব ছেড়ে বৃহত্তের আহ্বানে সাড়া দেওয়া যায় না, যায় না শিল্প সৃজনে শুধু নয়— সে কোন সৃষ্টিধর্মী কর্মে। এখানেই সত্তার গহনে গোপনে নিহিত যন্ত্রণাজাত জীবনের পূর্ণায়িত চিত্রায়ন—যাকে জীবনায়িত চিত্র বা চিত্রায়িত জীবন বললে অত্যুক্তি হয় না। এই চিত্রটি আপাত দর্শনেন্দ্রিয়বেদী হলেও অনুভূতিবেদী হিসেবে দ্যোতনা লাভ করেছে।